B2274
S C L Kolkata

সুভদ্রার ভিটে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর

করকমলে

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA

সুভদ্রার ভিটে

সলতে পুড়ে পুড়ে আপনা থেকেই প্রদীপ নিভে যায়। উমাশংকর ততোক্ষণ চুপচাপ সেই বেদীর সামনেই বসে থাকে। দীপের আলোকে তাঁকে যারই চোখে পড়ে তারই মনে হয় উমাশংকর কোন দেবীর বাণীর জন্যে অপেক্ষমাণ যেন।

সত্যি তাই। বাষট্টি বছর কেটে গেছে গোবিন্দশরণের এমনি ভাবে। তাঁর দেহাবসানের পর জ্ঞাতি ভাইয়ের ছেলে উমাশংকরের ওপর পড়েছে সে দায়িত্ব। পদ্মার ভাঙনে গোবিন্দশরণের বৃদ্ধ পিতা এসেছিলেন এই গাঁয়ে। এসেছিলেন উদ্বাস্তু হয়ে আরো কয়েক ঘর জ্ঞাতি কুটুম্ব নিয়ে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে। কিন্তু সে শোক তাঁকে সহ্য করতে হয়নি বেশিদিন। আরো কিছুদিন বাঁচলে গভীরতর অপমান ও আঘাতে মর্মাহত হতে হতো তাঁকে। বৃদ্ধ তা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে গেছেন।

পিতার মৃত্যুর পর গোবিন্দশরণের ওপরই ভার পড়ে রাজপুরোহিতের কাজকর্ম করার। বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পূজার্চনার কাজ মোটামুটি বেশ শিখেও নিয়েছিলেন গোবিন্দশরণ। কাজেই বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি তাঁকে। কিন্তু বিপদ হলো তাঁর সুভদ্রাকে নিয়ে। সকালবেলা রাজবাড়িতে পূজোয় চলে যাবার পর সুভদ্রা একা একা ভয় পান। কিন্তু এর কী প্রতিকার করতে পারেন গোবিন্দশরণ? পিতার মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁকে তাঁর ছয় বছরের বিবাহিত জীবনে এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে হয়নি সুভদ্রার কোন বিষয় নিয়ে। কাজেই তাঁর অনভ্যস্ত মন কোন সমাধান-পথই খুঁজে পায় না।

আমায় না হয় কিছুদিনের জন্যে বাবার কাছেই রেখে এসো। এখানকার লোকজনদের খুব ভালো লাগছে না আমার।—একদিন রাত্রিতে সুভদ্রা চুপি চুপি বলেন গোবিন্দশরণকে।

কেন, কি হয়েছে বলতো।

না, তেমন কিছুই হয়নি। তবে আজ ক'দিন ধরে জমিদারের লোক নানা অছিলায় যখন তখন এসে বিরক্ত করে। যে সময়ে তোমার বাড়িতে থাকার কথা নয় সে সময়ে এসে তোমার খোঁজ করার অর্থ হয় কোন? তাইতো কেমন কেমন মনে হয় যেন আমার।

আরে দূর পাগলি! রাজ-পুরোহিতের বাড়ি, খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এ বাড়ির আশে পাশে এগুতে সাহস পেতে পারে কেউ? কার ঘাড়ে ক'টা মুণ্ডু আছে, শুনি!—বীরত্বপূর্ণ উক্তিতে গোবিন্দশরণ ভয় কাটিয়ে দিতে চায় সুভদ্রার। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হয় না।

তা হলেও এতো সাহসের কীই বা দরকার। মায়ের কাছে না হয় কিছুদিন কাটিয়েই আসি। অনেককাল তো আর বাপের বাড়ি যাইনি। কাজেই তোমার আপত্তি করারও কোন কারণ থাকতে পারে না।

সে অন্য কথা। তা যাবে। আর এও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আমাদের কমলপুরের মানুষদের সঙ্গে এই সোনারগাঁয়ের মানুষদের যেন আকাশ-পাতাল তফাৎ। ছোটবেলা থেকে দেখেছি, সেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আত্মীয় আপনজন। বাবা তিন মাইল পথ হেঁটে রোজ চলে আসতেন এ গাঁয়ে রাজবাড়িতে মহাদেবীর পূজো করতে। কিন্তু প্রতিবেশীরাই তো আমাদের সারাদিন দেখাশুনো খোঁজখবর করতেন। সোনারগাঁয়ের মানুষদের মধ্যে সে ভাব সত্যি দেখা যায় না।

কি করেই বা সে ভাব দেখা যাবে? এখানে সবাই তো জমিদারকে আর তাঁর সাংগোপাংগদের খুশি করার চেষ্টায়ই মত্ত। একজনের বিপদে আর একজন এসে তার পাশে দাঁড়াবে সে আশা এখানকার লোকদের কাছে না করাই ভালো।—সুভদ্রা আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেন গোবিন্দশরণকে।

বেশ, তা হলে তুমি কবে যেতে চাও শ্রীধরপুর, বলো। আমাকে তো আবার সেভাবে তৈরি হতে হবে তার জন্যে। অন্তত দু'তিন দিনের মতো মহাদেবী মন্দিরের জন্যে একজন পূজারীর ব্যবস্থাও করে দিয়ে যেতে হবে। তা না হলে ম্যানেজার ছুটিই বা মঞ্জুর করবেন কেন?

যতো শীগ্‌গির যাওয়া যায় ততোই ভালো। আমার আর একদিনও থাকতে ইচ্ছে করছে না এখানে। আচ্ছা, তুমিও কিছু বেশি দিনের ছুটি নিয়ে চলো না! যে পূজারীকে ঠিক করবে তাঁকে অন্তত মাস দুয়েকের ভার দিয়ে গেলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। তোমার শরীরটাও তো ভালো যাচ্ছে না কিছু দিন ধরে।

আচ্ছা, তা দেখা যাবে'খন।—উত্তর দেন গোবিন্দ।

রাজপুরোহিত গোবিন্দশরণ কিছুদিনের জন্যে সস্ত্রীক বাইরে চলে যাচ্ছেন। কথাটা রটে যায় সারা গাঁয়ে। রাজা যোগেন্দ্রকিশোরের কানেও পৌঁছয় গোবিন্দশরণের এ সিদ্ধান্তের কথা। ম্যানেজারকে ডেকে পাঠান যোগেন্দ্র-কিশোর। গোবিন্দের ছুটির আবেদন মঞ্জুরের নির্দেশ হয় ম্যানেজারের ওপর। তা ছাড়া একটা বিশেষ ইংগিতও বুঝে নিতে হয় ম্যানেজারকে জমিদারের কাছ থেকে।

সোনারগাঁয়ের জমিদার যোগেন্দ্রকিশোর। পৈতৃক 'রাজা' উপাধি একশো বছর আগের। ইংরেজ-পদলেহনের।

বংশানুক্রমিক পুরস্কার। প্রজাপীড়ন এঁদের অস্থিমজ্জায় সংক্রামিত হয়ে চলেছে বংশপরম্পরায়।

ম্যানেজার হাসিমুখেই দু'মাসের ছুটি মঞ্জুর করেন। ছুটি পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন গোবিন্দশরণ। তাঁর সুভদ্রার কথা তিনি রাখতে পেরেছেন, এই তাঁর আনন্দের আসল কারণ। দু'মাসের ছুটির মানে দু'মাসের আয় থেকে বঞ্চিত থাকা। গোবিন্দের তা অজানা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোবিন্দ খুশি। দু'জনার সংসার, কতোই বা আর অর্থের প্রয়োজন? জীবনে অর্থের চেয়ে আনন্দের প্রয়োজন তো কম নয়।

গোবিন্দশরণ কি করে এ ছুটিটা ভোগ করবেন তার একটা ছক কেটে ফেলেছেন রাতারাতি। প্ল্যানটা সুভদ্রাকেও বলেছেন। তবে নিত্য চার ঘণ্টা করে শাস্ত্রাধ্যয়নের ব্যবস্থাটা তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। চার ঘণ্টা করে শাস্ত্রপাঠ করতে গেলে আর বিশ্রাম হবে কি করে, তাই এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেছেন সুভদ্রা।

রাজা সাহেব কোলকাতা রওয়ানা হয়ে গেছেন ইতিমধ্যে কি একটা জরুরী কাজে। সোনারগাঁ কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে তাঁর অনুপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে। প্রতিবারই তেমনি হয়ে থাকে। তবে এবার যেন একটু বেশি নীরব নিঝুম। কেন? গোবিন্দশরণ আর সুভদ্রাও পরদিন চলে যাবেন বলে? দূর, তা কি হয়? সোনারগাঁয়ের মানুষের কাছে গোবিন্দশরণ আর সুভদ্রার কী এমন গুরুত্ব?

জ্যৈষ্ঠের দারুণ গ্রীষ্ম। বেলা ১১টার পর আর লোকজনের মুখ বড়ো একটা দেখা যায় না পথে ঘাটে। সকলেই যে যার ঘরে আটক।

সেই মাঝ দুপুরে গোবিন্দশরণের ঘরের দোরে এসে কে ডাকে:

মা ঠাকরুণ!

নতুন কণ্ঠস্বর শুনে সুভদ্রা দেবী আরো বেশি করে ভয় পেয়ে যান। প্রথম ডাকে উত্তর দিতে সাহসই পান না মোটে।

মা ঠাকরুণ!

কে?—অনেক সাহসে বুক বেঁধে প্রশ্ন করেন সুভদ্রা।

এই যে আমি মাইজি! ঠাকুরকর্তা খবর পাঠিয়েছেন, আজ বাড়ি ফিরতে তাঁর একটু বেশি রাত হবে—আপনি যেন চিন্তা না করেন।

গোবিন্দশরণ নিজে লোক পাঠিয়েছেন শুনে নির্ভয়ে ঘরের দরজা খুলে দেন সুভদ্রা বিস্তারিতভাবে সব খবর শোনবার জন্যে! কিন্তু কী সর্বনাশ, দরজা খোলামাত্র পাঁচ ছয়জন লোক ঘরে ঢুকে মুখ-হাত-পা বেঁধে ফেলে সুভদ্রার মুহূর্তের মধ্যে। মদন সর্দারের বিভীষণ মূর্তি দেখেই জবাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সুভদ্রার। মদন আর তার লোকজনেরা যখন তাঁকে ঘাড়ে করে নিয়ে ম্যানেজারের বজরায় তুলে দিয়ে আসে পদ্মার ঘাটে, তখনো তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। দু'দিন বাদে কোলকাতায় রাজা সাহেবের বাড়িতে যখন তাঁকে নিয়ে তোলা হলো তখনো তিনি একরূপ অবসন্ন।

সুভদ্রাকে সুস্থ করে তোলার জন্যে রাজা সাহেবের চেষ্টার অন্ত নেই। আদরের মাত্রাধিক্যে অসুস্থ সুভদ্রা আরো যেন হাঁপিয়ে ওঠেন। সেই ক্লান্তি নিয়েও বার বার রাজা সাহেবের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে চলেছেন সুভদ্রা। লালসার তীব্র দাহনে দগ্ধ যোগেন্দ্রকিশোর অস্থির মত্ততায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন একেবারে! জোর করে আলিংগনপাশে তিনি আবদ্ধ করেন সুভদ্রাকে। দুর্বল সুভদ্রার প্রাণপণ প্রয়াস ব্যর্থ হয় রাজা সাহেবের দৃঢ় হাতের বেষ্টনী থেকে নিজেকে

ছিনিয়ে নেবার। কিন্তু কামার্ত জমিদার মুহূর্তের মধ্যেই টের পান, যে দেহের ওপর তাঁর জবরদস্তি চলেছে সে দেহ উত্তাপহীন, অসাড়, প্রাণহীন—তাঁর চাওয়া সুভদ্রা নেই সেখানে।

যোগেন্দ্রকিশোরের হস্তচ্যুত সুভদ্রার অসাড় দেহ লুটিয়ে পড়ে মার্বেল পাথরের শীতল মেঝের ওপর। সেই নিরুত্তাপ দেহের শীতলতায় দারুণ গ্রীষ্মের দিনেও রাজা সাহেবের কোলকাতা ভবনে যেন তুষার শৈত্য নেমে আসে। সে শীতের ঠাণ্ডায় রাজা সাহেবের অস্থিমজ্জাও কেঁপে ওঠে ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু তারপরেই আবার সব ঠিক।

মদন !

হুজুর !—বিরাট লাঠি হাতে সর্দার এসে সেলাম ঠোকে।

সব ব্যবস্থা করে ফেল সরকারবাবুকে ডেকে নিয়ে।

যে আজ্ঞে !—আর একবার সেলাম জানিয়ে বিদায় নেয় মদন সর্দার।

তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। মদন সর্দার আর তার দলবল অগ্রিম পুরস্কারের পরেও আরো বেশ কিছু পুরস্কার পেয়ে সোনারিগাঁয়ে ফিরে আসে। ম্যানেজার ছাড়া আর কেউ জানে না তাদের এই আসা যাওয়ার কথা। সারা গাঁয়ের মানুষ তখন সুভদ্রার সন্ধানে ব্যস্ত। ম্যানেজার সেই সন্ধান-কার্যের মূল কর্তা। মদন সর্দারের দলবলও সেই খোঁজাখুঁজিতে যোগ দেয়। শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির কোন অভাব নেই কোন দিকে। কিন্তু কে দেবে সুভদ্রার সন্ধান ?

গোবিন্দশরণ সব আশা-ভরসা ছেড়ে দেন। কিন্তু সকাল সন্ধ্যায় তিনি যেন প্রতিদিন শুনতে পান তাঁর বাড়িতে সুভদ্রার চলাফেরার শব্দ।

রাজা সাহেব ফিরে এসেছেন। সুভদ্রার কাহিনী শুনে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন গোবিন্দশরণকে। তাঁর যেন সবই জানা। সুভদ্রার মতো একটি তরুণীকেই নাকি তিনি একদিন দেখেছেন কোলকাতার রাজপথে কোন এক ধনী-সন্তানের সঙ্গে।

রাজা সাহেবের কথায় নির্বাক হয়ে যান গোবিন্দশরণ। কোন কথাই ফোটে না তাঁর মুখে। কী উত্তর দেবেন তিনি ? তবে কি সুভদ্রা পলাতকা ? না, কিছুতেই তা হতে পারে না। গোবিন্দশরণকে কিছুতেই বিশ্বাস করানো সম্ভব নয় সে কথা।

মধ্যাহ্নের নীরবতায় পাতলা বাতাসে গোবিন্দের কানে প্রতিদিনই ভেসে আসে সুভদ্রার কণ্ঠস্বর। রাজা সাহেবের মিথ্যাভাষণের প্রতিবাদে সুভদ্রা অতি সংগোপনে তাঁকে যেন রোজই এসে জানায়, 'আমি পলাতকা নই, আমি তোমারই'।

তাঁর শোবার ঘরের পাশে শেফালি গাছের তলায় সুভদ্রার নামে একটি তুলসী বেদী তৈরি করে নেন গোবিন্দশরণ। দিনের সমস্ত অবসর সময় তিনি কাটিয়ে দেন সেই বেদীমূলে। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে থাকেন তিনি সেখানে যতোক্ষণ না সে প্রদীপ জ্বলে জ্বলে নিভে যায়। গোবিন্দশরণ বলেন, জীবন-মরণের ঊর্ধ্বে যে প্রেম সেই প্রেমের মৃত্যু নেই—সে প্রেমেরই নিত্য পূজারী তিনি।

গোবিন্দশরণও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু সুভদ্রার বেদীতে এখনও প্রদীপ জ্বলে। সে প্রদীপ জ্বালবার ভার পড়েছে জ্ঞাতি ভাইয়ের ছেলে উমাশংকরের ওপর। সে বেদী সোনার গাঁয়ের মানুষের কাছে দেবী-পীঠ। সুভদ্রার কণ্ঠস্বর আজও নাকি অনেকে শুনতে পায়। সুভদ্রার ভিটেতে আজও তাই লোকের ভিড় জমে।

সেতু

কোন্ মায়াবী যেন অদৃশ্যলোক থেকে সূচীতীক্ষ্ণ তীরক্ষেপে ভীষ্মের নতুন শরশয্যা রচনা করছে !

পরনে দামী বিলিতি ওর্স্টেড স্যুট। তার ওপর পুরু চেষ্টারফিল্ড। মাথায় ফেল্টের টুপি আর পায়ে গরম পশমী মোজা। কিন্তু তাতেও কি রক্ষা আছে? প্রচণ্ড শীতে শরীরের ভেতর হাড়গুলো যেন ঠোকাঠুকি করতে স্থরু করে দেয় নিজেদের মধ্যে।

কোত্থেকে এলো বরফের মতো ঠাণ্ডা এমনি কন্‌কনে হাওয়া ? আগের দিন পর্যন্ত শীতের এতোটা তীব্রতা ছিল না। অথচ আজ বাইরে পা বাড়াতেই প্রাণান্ত-প্রায়।

ফার্ণডেল হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতে যেতেই ভয় ধরে যায় স্বর্ণকমলের মনে।

শেষ পর্যন্ত না জানি ফিরেই আসতে হয় অর্ধেক পথ থেকে।—এই বলে রবিঠাকুরের এক টুকরো কবিতা আউড়ে ফেলে স্বর্ণকমল্ঃ

'তোমার অঞ্চল তলে লুপ্ত হোক যত ক্ষতি লাভ।'

আরে দূর পাগল ! ঠিক দেখবে সন্ধ্যার মধ্যেই তোমায় বহাল তবিয়তে হোটেলে এনে পৌঁছে দেবো।—অনংগ অভয় দেয় বন্ধুকে।

কিন্তু যাই বলো ভাই, চেরা দেখবার সখ হয়েছে বলেতো আর জমে বরফ হয়ে যাবার ইচ্ছে নেই।

কী আশ্চর্য, কিচ্ছু ভয় নেই তোমার। সব দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। আর যদি চাও, একটা রিস্ক-ইন্সিওরেন্সও করে নিতে পারো।—ঠাট্টা করে বলে অনংগ।

পোষাক-পরিচ্ছদ। অথচ কী সুতীব্র শীত! আশ্চর্য লাগে কোন্ পথ।

পুরু কুয়াশার পর্দা যখন আচ্ছন্ন করে রাখে দৃষ্টি কিংবা আকাশ জুড়ে চলে মেঘের জটলা, তখন শীতের কানামাছি খেলার পালা এখানে। এলো কি না এলো।

পাহাড়ী বুনো মেয়ের মতোই খেয়ালী পাহাড়ী শিলঙ্-এর এলো-মেলো শীত।

'শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন
আমলকির এই ডালে ডালে।'

—রবি ঠাকুরের গান সুরু করে দেয় স্বর্ণকমল, ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে।

একেবারেই কবি বনে গেলে দেখ্ছি!—শিলঙ্-এ আসা অবধিই স্বর্ণকমলের কেমন একটা আনমনা ভাব লক্ষ্য করছে অনংগ। স্থানমাহাত্ম্যই হয়তো হবে। বছর তিনেক আগেও কোলকাতায় স্বর্ণকমলের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তখনো কিন্তু তাকে এমনি কথায় কথায় বা উঠতে বসতে কবিতা আওড়াতে শোনা যায়নি।

আরে ভাই জীবনটাই তো গান। গানের সুর আর কবিতার ছন্দকেই যদি বিদায় দিয়ে দিই তা'হলে কোন্ পাথেয় নিয়েই বা আর চলবো জীবন-পথে?—এ উত্তরের পর আর এ প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করতে চায় না অনংগ।

স্কুল-জীবনের সহপাঠী স্বর্ণকমল আর অনংগ। কিন্তু প্রথম জীবনের সেই অন্তরংগতাকে চল্লিশোত্তর বয়েস পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসা দু'জনের আন্তরিকতাই প্রমাণ করে। গৌহাটি কটন কলেজে পড়া শেষ করে অনংগ শিলঙ-সেক্রেটারিয়েটে কাজ করছে সে আজ অনেক বছরের কথা। স্বর্ণকমল কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে ঝাঁপিয়ে

পড়েছে দেশের মুক্তি-সংগ্রামে। বিয়াল্লিশের বহ্নিতে জ্বলে-পুড়ে সে যখন বেরিয়ে এলো জেল থেকে, তখন সে আগে উজ্জ্বল আরো দীপ্ত—বাস্তবিকই স্বর্ণকমল। এতো দূরত্ব আর এতো পার্থক্য সত্ত্বেও অনংগের সঙ্গে তার সেই ছোটবেলার বন্ধুত্বকে সে কখনো ভোলেনি, অনংগও ভুলতে দেয়নি।

শিলঙ্-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেও অনংগ যে কল-কারখানা ও জনকোলাহলময় কোলকাতাকে ভুলে গেছে তা মোটেই নয়। কৈশোরের স্বপ্নপুরীকে প্রায়ই মনে পড়ে তার। তাই বছর দু'বছর পর পর সুযোগ পেলেই সে ছুটে আসে কোলকাতায়। কিশোর জীবনের সহযোগীদের খুঁজে খুঁজে বার করে সে। নিমন্ত্রণ করে যায় তাদের প্রকৃতির লীলানিকেতন শিলঙ্ দেখে আসার জন্যে।

স্বর্ণকমল শিলঙ্-এ এসেছে তিন বছর আগের তেমনি এক আমন্ত্রণ রক্ষা করতেই। সে বেড়াতে এসেছে মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে। এমনি অল্প সময় হাতে নিয়েই সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। অনেক দেশ-বিদেশে যেতে হবে যে তাকে! একই জায়গায় বেশিদিন থাকতে গেলে সময়ে কুলোবে কেন? খুঁজে বার করতেই হবে যে ঊর্মিলাদিকে!

অনংগের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও, তার আতিথ্য গ্রহণে কিন্তু স্বর্ণকমল কিছুতেই রাজি হয়নি। শিলঙ্ শহরের অতিথি হবে সে, কোন আত্মীয় বা বন্ধুর নয়—একথা সে আগেই চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছে অনংগকে। স্বর্ণকমলের ফার্ণডেল হোটেলে ওঠার কারণও তাই।

শিলঙ্ থেকে চেরাপুঞ্জি। ত্রিশ-বত্রিশ মাইলের মতো পথ। গাড়ি এগিয়ে চলে দুই বন্ধুকে নিয়ে। বন্ধ গাড়ি, কিন্তু তবুও কোথা দিয়ে যেন প্রবল প্রচণ্ডতায় শীতের শরজাল এসে বিদ্ধ করে স্বর্ণকমলকে। বরফ জমে গেছে যেন তার সব

পোষাক-পরিচ্ছদে। তা' হলেও যেতেই হবে। কোথায় কোন্ পাহাড়ের গহ্বরে লুকিয়ে আছেন ঊর্মিলাদি কে জানে!

শহরের বুক চিরে এগোয় ট্যাক্সি! বাড়িতে কি একটা কথা বলে আসতে ভুল হয়ে গেছে অনংগের। তাই লাবান হয়ে যেতে হয় তাদের। লাবান পেরিয়ে পথ ঘুরে ঘুরে বেশ একটা নিরিবিলি জায়গায় এসে পড়ে গাড়ি। চমকে ওঠে স্বর্ণকমল। 'একটু থামো' বলে থামিয়ে দেয় ড্রাইভারকে।

কী হলো আবার?

না, কিছু নয়। রবি ঠাকুরের শেষের কবিতার শিলঙ্-এর ছবি দেখছি এখানে। একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

ও তাই নাকি! হ্যাঁ শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ যখন শিলঙ্-এ ছিলেন তখন তিনি এদিকটায় রোজই বেড়াতে আসতেন।— অনংগের মুখ থেকে এ কথা শোনার পর স্বর্ণকমল আর একবার বেশ ভালো করে চারদিকে তার চোখ ঘুরিয়ে নেয়।

গাড়ি আবার চল্‌তে সুরু করে। পাহাড়কাটা আঁকা-বাঁকা পথ। দশ হাত আগে-পিছেও অনেক সময় বোঝবার উপায় থাকে না পথের গতি কোন্‌মুখো। কখনো কোন্ অতলে যেন নেমে যায় গাড়ি, আবার কখনো বা উঠে যায় সুউচ্চে! এই অবিরাম অজানা চলায় বেশ আনন্দ লাগে স্বর্ণকমলের। সময় সময় আবার ভয়ও লাগে।

দু'ধারে দূরে-কাছে সব লাল-শাদা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি। পাকা দালান নয়, কাঁচা। ভূমিকম্পের দেশ। পাকা বাড়ি তুলতে বড়ো বেশি ভরসা পায় না কেউ। তা'হলেও বাংলো বাড়িগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। চলার পথ থেকে কখনো অনেক উঁচুতে, আবার কখনো বা অনেক

নীচুতে। এই পাহাড়ী পরিবেশের জন্যেই হয়তো এতো সুন্দর দেখায় বাড়িগুলো। স্বর্ণকমল মনের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করে। কে জানে এরই কোন একটা বাড়িতে উর্মিলাদি এসে নতুন করে সংসার পেতেছেন কিনা! যদি এসেই থাকেন তাঁকে তো দোষ দেবার নেই কিছু।

শিলঙ্-এর লাল-শাদা বাড়ি আর চোখে পড়ে না। শহর এলাকা শেষ হয়ে যায়। খুব তাড়াতাড়িই যেন শেষ হয়ে যায়।

তখনো পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাইনের অজস্রতা। মনের ক্ষতে স্নিগ্ধ হাতের প্রলেপ লাগায় তারা। শিলঙ্-রাণীর সখীকুল হবে হয়তো। তাই বুঝি শিলঙ্-অতিথির দিকে এতোটা প্রিয় দৃষ্টি! উর্মিলাদি ওদেরই মধ্যে একজন হয়ে যাননি তো আবার! শিলঙ্-রাণীর সখী! কিন্তু তারাও হঠাৎ বিমুখ হয়ে যায় যেন। আরো কিছু পথ এগিয়ে যেতেই তাদের আর চোখে পড়ে না। সখীকুল দূরে থাকতে পারে কখনো? শিলঙ্-রাণীকেই তারা ঘিরে আছে।

একটানা গাড়ি চলায় ঘুম এসে যায় অনংগের। সে ঘুমোয়। বেশ নিবিড়ভাবেই ঘুমোয়।

ছোট ছোট অনেক স্রোতধারার সাক্ষাৎ মেলে পথে। শিলঙ্-শহরেও এমনি স্রোতস্বিনী অনেক দেখেছে স্বর্ণকমল। মন চায় না নদী বলতে। তবু এদের সব ক'টিই নাকি এক একটি পাহাড়ী নদী। স্থানীয় নাম ছড়্‌ড়া। প্রত্যেকটিই ভারি লাজুক। পালিয়ে পালিয়ে চলে কেবল। উর্মিলাদির মতোই অনেকটা। মনের খুব কাছে এসেও পরক্ষণেই উধাও! একটা হঠাৎ আলোড়নের বুদ্‌বুদ যেন।

শুধু পাহাড় আর প্রান্তর। শ্রীহট্টের দূরবিস্তৃত সমতল ভূমি চোখে পড়ে বহুদূর থেকে। কী মনোরম সে দৃশ্য! উর্মিলাদি ওখানেই চলে যাননি তো!

'কোথা যে উধাও হলো'—রবীন্দ্রনাথের আর একখানা গান ধরে স্বর্ণকমল।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুকোমল স্পর্শ লাগে অনংগের চোখের পাতায়। তার ঘুম ভেঙে যায়।

তুমি যে এতো ভালো গান জানো তা কিন্তু জানা ছিলো না আমার।—গান থামতেই অনংগ বলে।

তাতো তোমার জানার কথাও নয় ভাই। এই ধরো বছর আড়াই হলো আমি গান নিয়ে মেতে আছি। ঘুরে ঘুরে বেড়াই, গান করি আর বই পড়ি।

ঘুরে ঘুরে বেড়াও মানে! কেন, তোমার সেই কাত্রাসগড় কয়লাখনির ম্যানেজারি কী হলো, যেখানে আমায় নিয়ে গেছলে একদিনের জন্যে ?

দূর, কিসের আবার ম্যানেজারি ? কার জন্যেই বা ওসব ঝামেলা পোয়াবো! জেল থেকে ফিরে আসার পর বাবা তাঁর এক খনির মালিক বন্ধুকে ধরে আমায় ফাঁদে ফেলার ব্যবস্থা করলেন। একটা বড়ো চাকরিতে বসিয়ে দিলেন। সত্যি সত্যি একটু আটকেও গিয়েছিলুম আমি। তবে সবাই মিলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করলে যে, আমায় সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে আসতে হলো।

একি বলছো তুমি স্বর্ণকমল ?

এতে আশ্চর্য হবার মোটেই কিছু নেই। এই বেশ আছি। বছর কয়েক চাকরি করে যা জমিয়েছিলাম, আর চা-বাগানের শেয়ার থেকে যে টাকাটা আসে, তা দিয়ে বাকি জীবনটা ঘুরেফিরে নিশ্চয়ই কাটিয়ে দিতে পারবো।—খুব ভরসার সঙ্গেই একথাগুলো বলে যায় স্বর্ণকমল। কিন্তু তার এই বলার মধ্যে এমন একটা বেদনার সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে যা অনংগের মনকে দোলা দেয় ক্ষণিকের জন্যে।

কী এমন ঘটতে পারে এ কয় বছরের মধ্যে যাতে এমন বিবাগী হতে হয়েছে স্বর্ণকমলকে ?—আপন মনেই প্রশ্ন করে অনংগ। ভেবে পায় না কিছু।

দেখতে দেখতে চেরায় এসে থামে গাড়ি। এ কালের শিলঙ্ থেকে 'বিগত শতাব্দীর শিলঙ্-এ' এসে নামে অনংগ তার বন্ধু স্বর্ণকমলকে নিয়ে। একদা খাসি-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র, জমজমাট শহর। এখন একটি নীরব শান্ত পল্লী চেরাপুঞ্জি।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী এসে অভ্যর্থনা জানান অনংগদের। ওরা মিশনেরই অতিথি হয়ে এসেছে সেদিনের জন্যে। পার্বত্য এলাকার লোকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে, রোগ-চিকিৎসায় এবং বেকার সমস্যা সমাধানে মিশনের উদ্যোগে যে ব্যাপক প্রয়াস চলেছে, তার কথা শুনে এবং তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে খুবই খুশি হয় স্বর্ণকমল। স্বামীজীদের লোক-সেবায় বিদেশী মিশনারীদের প্রভাব যে অনেকটা হ্রাস পেয়েছে, তারও প্রমাণ পেতে দেরি হয় না মোটেই। খাসিয়া ছেলেমেয়েরা দলে দলে আশ্রমে আসে। সন্ন্যাসীদের কাউকে দেখলেই প্রণাম জানায় বিনম্রভাবে এবং পরামর্শ নেয় যার যেমন দরকার।

মানুষের সেবায় এই সন্ন্যাসীদের মতো আত্মোৎসর্গেই বোধ হয় সত্যিকারের শান্তি!—হঠাৎ কেমন একটা চিন্তার ঢেউ আসে স্বর্ণকমলের মনে।

অতিথিদের চেরাপুঞ্জি দেখাতে নিয়ে যান স্বামীজী। গাড়িতে মাইল দুই পথ যেতেই মৌসমি গ্রাম। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত এ গাঁয়ে। নাম মৌসমি ফলস্। মৌসমি ফলস্-এর ঠিক মুখোমুখি যেয়ে দাঁড়ায় গাড়ি।

এসো......সো......সো......বলে কে যেন ডাকে। ঊর্মিলাদির গলার মতোই যেন!—চমকে ওঠে স্বর্ণকমল।

একটানা সে শব্দ শুনে অনেকেরই অবাক হবার কথা। একেবারে নতুন যারা তাদের পক্ষে তো বটেই।

ওপরে খরখরে রোদ। আর দুই পাহাড়ের মাঝখানে কুয়াশার পুরু আস্তরণ! বিরাট বিস্তীর্ণ সে গহ্বরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপের জোটি নেই। অথচ তিনজনই সে দিকে তাকিয়ে।

'মুক্ত হও হে সুন্দরী। ছিন্ন কর রঙীন কুয়াশা।'—নেহাৎ অভ্যাসবশেই রবি ঠাকুরের এক লাইন কবিতা আবার আউড়ে ফেলে স্বর্ণকমল।

আশ্চর্য! হঠাৎ কিভাবে কী হয়ে গেল কিছুই বোঝবার উপায় নেই। রবি ঠাকুরের কবিতায় স্বর্ণকমলের আবেদন পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় যেন চলে গেল সেই কুয়াশার পর্দা!

কুয়াশা কেটে যেতেই চোখে পড়ে উল্টোদিকের পাহাড়ের গা গড়িয়ে পড়ছে সুদীর্ঘ এক রূপালী জলরেখা। আরো কয়টি ক্ষীণাংগীকেও দেখা যায় তার আশেপাশে। তারই সহচরী হবে হয়তো। অপূর্ব সে দৃশ্য! স্বর্ণকমল অভিভূত হয়ে যায় দেখে।

কার উদ্দেশ্যে এই পাহাড়ী কন্যার নিরুদ্দেশ যাত্রা? সে কি পাবে তার কাঙ্ক্ষিতকে খুঁজে? চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে যে অনেক বাধা! সেই বাধা অপসারণের প্রয়াসই বুঝি চলেছে অবিরাম গতিতে!—মৌসমি জলপ্রপাত দেখে এমনি সব কথা ঘুরপাক খেতে থাকে স্বর্ণকমলের মনে। কেমন একটা অদ্ভুত রকমের আকর্ষণ বোধ করে সে। ঐ রূপালী জলরেখার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে ইচ্ছা হয় তার।

কিন্তু পা দু'টোকে এতো ভারি ভারি মনে হয় কেন? পাহাড় চাপা পড়েছে যেন! স্বপ্নে যেমন পা চলে না ঠিক তেমনি। সে কি স্বপ্ন দেখছে তাহলে? আশ্চর্য বোধ করে স্বর্ণকমল। সর্বত্রই বাধা!

অনংগকে ডাকেন স্বামীজী। চমক ভাঙে স্বর্ণকমলের। নোকালিকাই প্রপাত, ডেভিড স্কটের স্মৃতি-ফলক, সেণ্ট ডন বস্কোর গীর্জা প্রভৃতি এক এক করে দেখে আসে তারা।

ঝুপ্-ঝুপ্ করে কোথা থেকে হঠাৎ বৃষ্টি নামে। কী অবস্থাই যে হতো গাড়িতে না থাকলে! খুব ধারেকাছে বাড়িঘরও নেই।

স্বামীজী কিন্তু খুব ভাগ্যবান বলে সার্টিফিকেট দেন স্বর্ণকমলকে। এক চান্স-এ মৌসমি প্রপাত দেখে যাওয়া কারুর ভাগ্যেই বড়ো একটা জোটে না। আলো-ছায়া আর রৌদ্র-বৃষ্টির এমন খেলা দেখার সুযোগ কদাচিৎ মেলে। চেরাতে প্রায় সারাক্ষণই বৃষ্টি নয় কুয়াশা। এখানে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কেউ ছাতা ব্যবহার করে না, ছাতা ব্যবহার করে বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে। অথচ সেই বৃষ্টি বা কুয়াশার জন্যে কোন অসুবিধাই তো ভুগতে হলো না! এ বৃষ্টি কিছুই নয়।

স্বর্ণকমলও বেশ খানিকটা আত্মতৃপ্তি বোধ করে স্বামীজীর কথায়। সে ভাগ্যবান! চারদিকের এই শ্মশান-শূন্যতার মধ্যে বৃষ্টির এই ব্যথাভরা কান্নার সুরটুকুই বা মন্দ কি!

কিন্তু সে বৃষ্টিই বা কতোক্ষণ! হঠাৎ থেমে যায়।

কে যেন মহাসমারোহ করে আসতে আসতে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল! নিশ্চয়ই আবার আসবে। চিরকিশোর চেরাকে চিরকালই তো এমনি করে মাতিয়ে রেখেছে বর্ষা!

ফুলে ফুলময় চারদিক। বৃষ্টিকণার স্পর্শ-সুখে লুটোপুটি খায় যতো পাহাড়ী ফুলেরা। হাসবে না ওরা? নিশ্চয়ই হাসবে। ঊর্মিলাদিকে কাছে পেলে স্বর্ণকমলেরও এমনি হাসি ফুটতো!

মোটামুটি সবই দেখা হয়ে যায় ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যে। স্বামীজী এবার অনংগদের নিয়ে যান শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত এক খাসিয়া পরিবারে।

কুবলাই!—গৃহকর্ত্রী আলমানোরা হাতজোড় করে নমস্কার জানান। আন্তরিক অভ্যর্থনায় ঘরে নিয়ে যান সকলকে।

চেরাপুঞ্জির আর সব বাড়ির মতোই পাথরের তৈরী ঘর। ওপরে ঢালাই টিনের চাল। ঘরের ভেতরটা পরিচ্ছন্নতায় মনোমুগ্ধকর। শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোর একধারে ধূপকাঠি পুড়ছে এক গোছা। সামনে পাথরের থালায় ঠাকুরের ভোগ এবং আর একধারে একখানা রূপোর রেকাবীতে নানা রকমের পাহাড়ী ফুল।

খাসিয়া পরিবার হলেও এ যেন সম্পূর্ণ বাঙালী পরিবেশ। স্বর্ণকমল আরো খুশি হয় স্বামীজীর মুখে শুনে যে, চেরায় এমনি অনেকগুলো খাসিয়া পরিবার মিশনের বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে। সরকারী সহযোগিতা পেলে বৈদেশিক মিশনারীদের প্রভাব থেকে এদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে আনা খুব শক্ত নয়, একথাও বলেন স্বামীজী।

গৃহকর্ত্রীর ডাকে চা আর মাখন-রুটির সাজানো' প্লেট নিয়ে আসে দু'টি মেয়ে। একটির বয়েস পনেরো-ষোল আর একটির বছর উনিশ। ভারি সুন্দর মেয়ে দু'টি। বাইরের উঠোনের গাছ-পাকা কমলালেবুর মতোই গায়ের রঙ অনেকটা। ঊর্মিলাদির রঙ-এর সঙ্গেও তুলনা করা চলে। মনে মনে ভাবে স্বর্ণকমল।

অসময়ে এতো খাবারের ব্যবস্থা? আপনার আয়োজন এ যাত্রায় আর কাজে লাগানো যাবে না দেখছি।—স্বামীজীকে লক্ষ্য করে বলে অনংগ।

প্রখর দৃষ্টি আলমানোরার। বাংলা কথা বুঝতে না পারলেও, গৃহকর্ত্রীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল অতিথিদের কথাবার্তা ও মুখভঙ্গির ওপর। সন্দেহ হতেই জিজ্ঞেস করেন, বা লাই অর্থাৎ কী হয়েছে ?

খাবার আয়োজন বড্ড বেশি হয়েছে, স্বামীজী একথা বলতেই আলমানোরা লজ্জায় মরে যান যেন। নিজেরই মুখ চাপা দেন নিজের দু'হাতে। পরক্ষণেই বলেন, তিনি বুড়ো মানুষ, তিনি আর কী করবেন, তবে তাঁর পুরুষ ঘরে থাকলে তাঁদের ঠিকমতো আদর-আপ্যায়ন হতো।

এরই একটু পরে কী যেন ইংগিত করেন গৃহকর্ত্রী। আর মেয়ে দু'টি সঙ্গে সঙ্গেই এক প্লেট করে কলা আর কমলালেবু নিয়ে আসে পেছনের ঘর থেকে।

আদর-আপ্যায়ন এতেও যদি সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে, আর পুরুষ ঘরে থাকলে যদি আরো আপ্যায়নের ব্যবস্থা হতো তা'হলে কী বিপদেই না জানি পড়তে হতো !—নেপথ্যে মন্তব্য করে স্বর্ণকমল।

মেয়ে দু'টি কে—জানতে চায় অনংগ।

স্বামীজী উত্তর দেবার আগেই আলমানোরা প্রশ্ন করে বসেন স্বামীজীকে—বা লাই অর্থাৎ কী ব্যাপার ?

জিজ্ঞাসা জেনে নিয়ে হেসে উত্তর দেন—কান্‌তাই। এ দু'টি যে তাঁরই মেয়ে গৃহকর্ত্রী তাই জানিয়ে দেন এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে।

সেন মাফি হাইং ?—অতিথিদের বাড়ি কোথায় জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেন আলমানোরা।

স্বামীজী জানান যে, কোলকাতা থেকে এসেছেন ওঁরা। আর অমনি মাথা মাটিতে ছুঁইয়ে প্রণাম করেন গৃহকর্ত্রী। খাস ঠাকুরের দেশের লোক, তাই এ অতিথিরা যে বিশেষ পূজ্য !

ভথা ডা উথাও বাম জা।—বাঙালী মানুষ, মাছ-মাংস দিয়ে চারটে করে ভাত খেয়ে যাবার প্রস্তাব আসে তাই

আলমানোরার দিক থেকে। কিন্তু স্বামীজী এক কথায়ই বাতিল করে দেন সে প্রস্তাব। তাঁর আয়োজন যে ব্যর্থ হয়ে যায় তা না হলে!

মাত্নই এসে পড়েন এর মধ্যে। আলমানোরার নতুন স্বামী মাত্নই। রোপওয়েতে কাজ করেন। বছর সাতেক আগে বিয়ে হয়েছে তাঁদের। ঐ দুই মেয়েকে রেখে আলমানোরার প্রথম স্বামী মারা যাবার পর মাত্নইকে জোয়ান ও কর্মঠ দেখে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছেন আলমানোরা।

মাত্নই অনেক ছোট আলমানোরার থেকে। অন্তত উনিশ বছরের ছোট। তবু যে তিনি তাঁকে স্বামিত্বে বরণ করেছেন সে শুধু প্রথাগত কোন বাধা নেই বলেই নয়, সংসারের প্রয়োজন আছে বলেও। জোয়ান পুরুষ না হলে কে দেখবে আলমানোরার সম্পত্তি, কে দায়িত্ব নেবে তাঁর দুই টুক্‌টুকে কন্যার!

মাত্নইকে দেখে আর তার পরিচয় পেয়ে প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিল অনংগ এবং স্বর্ণকমল দু'জনেই। কিন্তু দু'জনের চিন্তাধারা দু'রকম পথ ধরে চলে।

অনংগের মনে জাগে অস্বাভাবিকতার বিস্ময়। কিন্তু স্বর্ণকমলের মনে বিরাট জিজ্ঞাসা।

বৃদ্ধা আলমানোরার সম্পত্তি ও সংসার দেখার প্রয়োজনের চাইতেও একটি নিঃসংগ জীবনকে দেখার প্রয়োজন কি বেশি ছিলো না? বিয়ের এক বছর পার হতে না হতেই আগষ্ট বিপ্লবে আত্মাহুতি দেন নির্মলদা। স্বামীহারা উর্মিলাদি অকাল-বৈধব্যের ভয়াবহ নিঃসংগতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে নির্মলদার কোন প্রিয় সহকর্মীকে যদি বাকি জীবনের সহযাত্রীরূপে কামনা করে থাকেন, কী দোষ হয়েছিল তাতে? পরিবার-পরিজনদের বিরুদ্ধতায় ব্যর্থ হয়ে গেল দু'টি জীবন! কার কী লাভ হয়েছে

তাতে? উর্মিলাদির বয়েস যদি কিছু বেশিই হয়ে থাকে তাঁর কাংক্ষিতের চেয়ে, তাতে কঠোর আপত্তি বা বিরূপ সমালোচনা যে কেন হবে, তা ভেবেই পায় না স্বর্ণকমল।

আলমানোরার সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে মাতুই যদি সুখী হতে পারে, সে কি তাহলে উর্মিলাদিকে নিয়ে আরো বেশি সুখী হতে পারতো না!—ভাবতে ভাবতে তরংগক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে স্বর্ণকমলের মন। অনংগ ও স্বামীজী আর আলমানোরা ও মাতুইর কথাবার্তায় কানই দিতে পারে না সে কিছুক্ষণের জন্যে।

আবার হঠাৎ কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায় চারদিক। শুধু কুয়াশাই নয়, ঝির্-ঝির্ করে পড়তে থাকে অতি সূক্ষ্ম সব জলকণা। বাইরের কোন কিছুই আর দৃষ্টিপথে পড়ে না। ঘরের ভেতরেও আর কারুর মুখের দিকে চেয়ে কথা বলার উপায় নেই। কথা শুনে ঠাহর করে নিতে হয় বক্তাকে।

স্বর্ণকমলের চোখ ঝাপ্সা হয়ে গিয়েছিল কুয়াশা আসবার আগেই। তারও আগে থেকেই সে শুনতে পাচ্ছিল না কিছু। তবে উর্মিলাদির কথাই যদি না শোনা গেল, তা'হলে কীই বা আর শোনার থাকতে পারে তার কাছে? আর উর্মিলাদিকেই যদি দেখা না যায়, তা'হলে এমনি কুয়াশা চিরস্থায়ী হলেই বা তার কী ক্ষতি! একবার যেন ঠিক এমনিধারাই মনে হচ্ছিল স্বর্ণকমলের।

বিকেলে ফিরে যাবার পথে স্বর্ণকমলকে রোপওয়ে দেখিয়ে নেওয়া হবে, স্থির করেছে অনংগ। তাই হয়। স্বামীজীও সঙ্গে যান সে অবধি।

চেরা-ছাতক রোপওয়ে। চেরাপুঞ্জির নীরব নিস্তব্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এ ছাড়া অন্য যে কোন শিল্পোদ্যমই 'বে-মানান

বলে মনে হতো। এই রজ্জুপথে মালপত্র আনা-নেওয়া চলছে সমতলের সঙ্গে ১৯৩০ সাল থেকে।

দেশ ভাগ হয়েছে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন সমতলভূমির সঙ্গে সেই যোগবন্ধন আজও রক্ষা করে চলছে এই চেরা-ছাতক রোপওয়ে। বহুদূর বিস্তীর্ণ বিরাট বিচ্ছিন্ন সেই সমতলের কতো কাছে ছোট্ট এই চেরাপুঞ্জি! এতো কাছে শুধু এই সেতু-সংযোগের জন্যেই তো।

কাজেই যতো দূরেই থাকুন ঊর্মিলাদি, স্বর্ণকমলের সংগেই বা তাঁর প্রাণের যোগ অক্ষুণ্ণ থাকবে না কেন ?

রোপওয়ের সামনে উন্মুক্ত আকাশের নীচে অবারিত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে শুধু এই একটি কথাই ভাবে স্বর্ণকমল।

জলছায়া

দু'চোখের পাতা বেয়ে টপ্ টপ্ করে দু'ফোঁটা জল পড়ে চন্দ্রার। আবার একটু হাসিও ফুটে ওঠে ঠোঁটের কোণে।

চিঠিখানা পড়া শেষ করে বালিসের তলায় রেখে দেয় চন্দ্রা। পরক্ষণেই আবার চিঠিখানা তুলে এনে পড়তে সুরু করে। আবার অশ্রু-হাসির খেলা চলে তার চোখেমুখে।

এ অশ্রু আনন্দের। এ অশ্রু শুভ সংবাদে সুখ-চঞ্চল মনের নীরব প্রকাশ। কিন্তু এ হাসি? এ হাসিতে কেমন যেন একটা বেদনা-মিশ্রিত চিন্তার চিহ্নও সুস্পষ্ট।

হঠাৎ দিল্লী থেকে চিঠি এসেছে শুভেন্দুর। রাজধানী দিল্লী। কবে এবং কোথা থেকে যে শুভেন্দু রাজধানীতে গিয়েছে তার কিছুই জানে না চন্দ্রা।

পাটনা থেকে তার শেষ চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। সে চিঠিতেই সে জানিয়েছিল, সেখানে স্থায়ী কোন কাজের ব্যবস্থা করে উঠতে না পারলে সে একবার কানপুর ও লখ্নৌর দিকে যাবে ভাবছে।

এ রকম বিপদে প্রয়োজনবোধে চন্দ্রাও কাজে নামতে পারে, এ অনুমতিও শুভেন্দুর সে পত্রেই পাওয়া গিয়েছিল।

অনেক চেষ্টার পর দিল্লীতে শুভেন্দুর একটা পাকা কাজ জুটেছে কোন এক খবরের কাগজের অফিসে। প্রুফ রীডারের কাজ। কিন্তু এ যে কী কাজ তার কিছুই জানা নেই চন্দ্রার। তবে চার পাঁচ বছর ব্যাংকে সহকারী ক্যাশিয়ারের কাজ করার পর হঠাৎ খবরের কাগজের আফিসে শুভেন্দু যে কী করে কাজ

চালাবে এবং পাকা হলেও এ চাকরি যে কতোদিন সে রাখতে পারবে তা ভেবে ঠিক করতে পারে না চন্দ্রা।

মাইনের কথাও কিছুই লেখেনি শুভেন্দু। হয়তো লেখবার মতো নয়, তাই লেখেনি। তবে চন্দ্রাকে যখন চাকরি নিতে বারণ করেছে আগের অনুমতি বাতিল করে দিয়ে তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে, পুরো সংসারের খরচ তার উপার্জনেই চলে যাবে। শুভেন্দু একথাও লিখেছে, চন্দ্রা যদি তার বাচ্চা ছেলেটাকে মানুষ করে তুলতে পারে আর বুড়ো শ্বশুরকে তার সেবা যত্নে সন্তুষ্ট রাখতে পারে তা হলেই সে যথেষ্ট খুশি হবে।

শুভেন্দুর এই আকস্মিক চিঠিতে একই সঙ্গে আনন্দ ও অস্বস্তি বোধ করারই কথা চন্দ্রার পক্ষে। তার অনুমতি নিয়েই তো চন্দ্রা গত ছ'মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে টাইপ-রাইটিং ও সর্টহ্যাণ্ড শিখে নিয়েছে তার দাদার বন্ধু অশেষ-কুমারের সাহায্যে।

চন্দ্রার জন্যে একটা ভালো কাজের ব্যবস্থাও করে ফেলেছে অশেষকুমার। আসছে সপ্তাহেই তার ইণ্টারভ্যু।

অবশ্য সে ইণ্টারভ্যু নামে মাত্র। সে কথা অশেষকুমার চন্দ্রাকে আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছে। কাজেই কাজটা তার নিশ্চিত এবং সে-ও প্রস্তুত হয়েই আছে তা গ্রহণ করার জন্যে।

কিন্তু এখন কি করা যায়?

শুভেন্দুর চাকরি হয়েছে, এতো বড়ো একটা আনন্দের খবরের সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা নিষেধাজ্ঞার সংবাদ কেন, চন্দ্রা তা বুঝে উঠতে পারে না।

কি করে এখন চন্দ্রা তার অশেষদাকে বলবে যে, চাকরি সে করবে না। এতোদিন ধরে এতো হাঙ্গামা হুজ্জুতের পর

একটা কাজ জুটিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করতে গেলে মুখ থাকে কখনো ?

ভারি চিন্তায় পড়ে যায় চন্দ্রা। অশেষকুমারের সঙ্গে দেখা হলে কী যে সে বলবে তাকে ভেবেই পায় না। তাই বার বার সে খুলে খুলে দেখে শুভেন্দুর চিঠিখানা।

না, এখন কিছুই বলা হবে না অশেষদাকে। মনে মনে ঠিক করে ফেলে চন্দ্রা। প্রুফ রীডারের চাকরির দৌড় কতোটা তা একবার দেখেই নেওয়া যাক্ না! তা ছাড়া যে রকম বে-হিসেবি খর্‌চে লোক শুভেন্দু, তার ওপর খুব বেশি ভরসা করাও ঠিক নয়।

চন্দ্রা তাই আগে থেকেই পাওয়া কাজটাকে হাত-ছাড়া করতে নারাজ।

শুভেন্দুর চিঠির কথা চন্দ্রা স্রেফ চেপে যায় অশেষকুমারের কাছে। ইণ্টারভ্যু সত্যি যে নামে মাত্র তাতে কোন সন্দেহই নেই। একটি মাত্র কথাতেই যে একটা চাকরি হয়ে যেতে পারে তা তার জানা ছিল না।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর একবার মাত্র শুধু চাইলেন চন্দ্রার দিকে আর নামটা জিগ্যেস করলেন, তারপরই বলে দিলেন পরদিন থেকে অফিস করতে। টাইপ-রাইটিং বা সর্টহ্যাণ্ডের কোন পরীক্ষাই হলো না। অথচ সে কাজই নাকি করতে হবে তাকে।

চন্দ্রা আশ্চর্য হয়ে যায়।

একটা সার কোম্পানীর অফিস। সিন্ধ্রী সারের কারখানার এজেন্সী নিয়ে বেশ ফেঁপে উঠেছে এই লিমিটেড কোম্পানী। একজন মাড়োয়ারী অংশীদার থাকলেও অপরেশ সরকার তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং কোম্পানীকে বাড়িয়ে তোলার মূলেও রয়েছে বিশেষভাবে তাঁরই খাটা-খাটুনি।

খুবই সৌখিন লোক সরকার। চাকরি-প্রার্থী অশেষকুমারের ছিম্‌ছাম্‌ চেহারা আর তার চৌকষ কথাবার্তায় সরকার বুঝে নিয়েছিলেন যে, তাকে দিয়ে অনেক কাজ পাওয়া যাবে। গত সাত আট মাসের মধ্যে সত্যি সত্যি খুব সন্তোষজনক কাজও দিয়েছে অশেষকুমার। কাজেই আরো ভারি ভারি কাজের ভার তার ওপর চাপিয়ে দিতে এখন আর দ্বিধা করেন না সরকার।

অশেষকুমারও বেশ বুঝতে পারে যে, মালিক খুবই খুশি আছেন তার কাজে এবং তার উন্নতির পথও শীগ্‌গিরই খুলে যাবে যদি আর কিছুকাল কর্তার হুকুম ঠিক ঠিক মতো তামিল করে যেতে পারে।

সে চেষ্টায় কোন ফাঁকিও নেই অশেষকুমারের। কোম্পানীর হয়ে দিনরাত তার এদিক ওদিক এঁর কাছে তাঁর কাছে দৌড়োদৌড়ির অন্ত নেই। সারে ভেজাল অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে মাটি মেশানোর অভিযোগ থেকে 'সরকার ফার্টিলাই-জার' যে অব্যাহতি পেয়েছে সে কি সম্ভব হতো অশেষকুমারের ধরাধরি ছাড়া ?

পুলিশের কর্তা ব্যক্তিদের থেকে স্বরু করে কার সঙ্গে পরিচয় নেই অশেষকুমারের? তাইতো সরকার ধরেই নিয়েছেন, সব কাজই পাওয়া যাবে তার কাছ থেকে।

চন্দ্রা ঠিক টাইমেই অফিসে যায়। প্রথম প্রথম কয়েকদিন অশেষকুমারই তাকে নিয়ে গেছে আফিসে। এখন সে নিজেই যায়।

প্রথম মাসের মাইনে একশো কুড়ি টাকা পেয়েছে চন্দ্রা। শুভেন্দুও পাঠিয়েছে একশো টাকা। বেশ স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে সংসারে। চন্দ্রা জানায় নি এখনো শুভেন্দুকে তার কাজের কথা। ভাবছে জানাবে বলে।

চন্দ্রা তার নিঃসন্তান বিধবা বড়দিকে কাছে এনে নিয়েছে। আফিসের সময়টা বড়দিই সংসার আগলান। খোকনকে দেখার জন্যে একজন লোক না হলে চলে? এতে অবশ্যি দু'পক্ষেরই সুবিধে হয়েছে।

ইতিমধ্যে শুভেন্দুর আর একখানা চিঠি আসে। তাতেও আনন্দের খবর। প্রেস কমিশনের সুপারিশে তাদের নাকি আরও একশো টাকা আয় বাড়বে, এই আশার কথা জানিয়েছে শুভেন্দু। তখন আরো কিছু বেশি টাকা সে চন্দ্রাকে পাঠাতে পারবে বলে লিখেছে।

তখনো পর্যন্ত প্রেস কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হয়নি। খবরের কাগজের খবরের ওপর ভরসা করেই অতি উল্লাসে শুভেন্দু এই আশার কথা জানিয়েছিল চন্দ্রাকে। কিন্তু এও তো হতে পারে, চন্দ্রা যাতে কোন চাকরির দিকে ঝুঁকে না পড়ে সে জন্যেই শুভেন্দু তাকে আরো টাকার লোভ দেখিয়েছে। চন্দ্রা কিন্তু মনে মনে সে ভাবেই ব্যাখ্যা করে এই চিঠির।

কিছুদিন ধরে অশেষকুমারের কথাবার্তায় কেমন যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে চন্দ্রা।

এরই মধ্যে দু'তিন দিন অশেষকুমার তাকে বলেছে সরকারের কথামতো চলতে। কিন্তু সে তো কোন কথাই অমান্য করেনি সরকারের। একদিন সে তাই জিগ্যেসই করে ফেলে ঃ

আচ্ছা অশেষদা, আমায় তুমি একথা বলছো কেন বার বার? তার মানে তো আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

এর মানে তো অতি স্পষ্ট চন্দ্রা। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। মালিকের মন রক্ষা করে চললে তোমারই আখের ভালো হবে। তোমার কাজে খুবই খুশি আছেন সরকার। তাই আসছে মাস থেকেই তিনি তোমাকে একটা

স্পেশাল এলাউয়েন্স দেবেন বলে ভাবছেন। সে কথাটা তাঁর কাছ থেকে শুনতে পেয়েই আমি তোমাকে সব সময় তাঁর কথামতো চল্‌তে বলছিলাম।

অফিসের কাজে সরকারের কথা মতো আমি চলিনি এমন ঘটনা তো কখনো ঘটেনি। কাজেই তোমার একথা উঠতেই পারে না অশেষদা!

না চন্দ্রা, সেদিন তুমি সরকারের মনে একটু ব্যথাই দিয়েছ। তোমাকে নেহাৎ ভালোবাসেন বলেই তিনি সেদিন মেট্রোর ম্যাটিনি শো'তে তোমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আর তোমাকে নিয়ে যাবেন বলেই আমাকেও বলে রেখেছিলেন আগে থেকেই।

আমি সরকার সাহেবের কাজ করি, আমার কাজকেই তিনি ভালোবাসতে পারেন। কিন্তু তিনি আমাকে ভালোবাসেন আর তার জন্যে আমাকে নিয়ে তিনি সিনেমায় যেতে চাইবেন, এ যে কি করে তুমি ভাবতে পারো অশেষদা, তাও আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। তোমাকে আমি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই মনে করতাম। কিন্তু ......

সে কি চন্দ্রা, তুমি আমায় এমনি করে ভুল বুঝতে বসেছ?— অশেষকুমারের শুধু গলাই কেঁপে ওঠে না এ কথাটুকু বলতে, চন্দ্রার কড়া জবাবে ও কঠোর চাউনিতে শিউরে ওঠে তার সারা শরীর।

ভুল বোঝাবুঝি নয় অশেষদা! তুমি আমাদের অনেক সাহায্য করেছ এ কমাস ধরে, একটা কাজও জুটিয়ে দিয়েছ তুমিই। তার জন্যে আমি সত্যি সত্যিই কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। কিন্তু সে কৃতজ্ঞতার ঋণশোধ হবে তোমার অপমানের মধ্যে দিয়ে—সে আমি হতে দিতে পারি না।

সে আবার কি কথা?

সরকারের কথায় আমি যদি সেদিন তার সঙ্গে সিনেমায় যেতাম আর তাতে যদি আমাকে কোনরকম অপমানী হতে হতো কিংবা ধরো যদি মিথ্যে করেই আমার বিরুদ্ধে কোন কলংক রটনা হতো তার জের কি তোমায় টানতে হতো না অশেষদা, সে অপমান কি তোমাকে স্পর্শ করতো না ?

নিশ্চয়, আমাকেও তার জের টানতে হতো বৈকি! কিন্তু চন্দ্রা, সত্যি বলছি আমি ভালো মনেই এবং তোমার ভালো চিন্তা করেই সরকারের কথামতো চল্‌তে তোমায় উপদেশ দিয়েছিলাম। তা, তুমি যদি আমার কথাকে সংগত বলে মনে না কর তা হলে আমার কথা নেবে না, তাতে আর কি আছে ?—নিজের মনের কথাকে সম্পূর্ণ গোপন করে সমস্ত ব্যাপারটাকেই বেশ কেমন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে অশেষকুমার। আর একথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠেও পড়ে চলে যাবার জন্যে।

রাগ করে চলে যাচ্ছ কেন অশেষদা, চা হচ্ছে যে!—চন্দ্রা বাধা দেয় অশেষকুমারকে।

না, সন্ধ্যে হয়ে এলো। একটা জরুরী কাজও আছে হাতে। আজ যাই, চা-টা বরং পাওনাই রইলো।—এই বলে তার মনের ভাবটাকে চাপা দিতে চায় অশেষকুমার।

না, তা হবে না। দু'মিনিটের মধ্যেই চা দিচ্ছি। তা ছাড়া একটা কাজের কথাও আছে তোমার সঙ্গে।

বেশ, বলো কি কথা।

আচ্ছা অশেষদা, আমি এক সপ্তাহের ছুটি পেতে পারি ?

তাতো সরকার সাহেবের মর্জি। তা তুমি ছুটি নিশ্চয়ই পাবে। তোমার কাজে এতো খুশি সাহেব, তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর না হয়ে পারে কখনো ?

অশেষকুমারের এ জবাবের মধ্যেও কেমন একটা ইংগিত অনুভব করে চন্দ্রা। তবে এর উত্তরে সে আর বলে না কিছু। চুপ করে রান্না ঘরে চলে যায়। চা তৈরী করে নিয়ে আসে। অশেষকুমারকে চা দিয়ে এক রকম চুপ করেই তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

ছুটি পাবে এ নিশ্চয়তা পাওয়ায় চন্দ্রা আনন্দিতই হয়ে থাকবে। হয়তো আগের বাদানুবাদের তিক্ততাও অনেকটা সে ভুলে গিয়ে থাকবে। চা খেতে খেতে এমনি ধারায় ভাবতে থাকে অশেষকুমার।

চন্দ্রা, যাই তা হলে। তুমি ছুটির দরখাস্তটা দিয়ে দিও। আমার সঙ্গে সরকার সাহেবের আজই দেখা হবে। আমিও বলে রাখব'খন তাঁকে।

আচ্ছা!—চন্দ্রা নির্বিকার চিত্তে বিদায় দেয় তার অশেষদাকে।

পরদিন চন্দ্রা অফিসে যায় অন্যান্য দিন অপেক্ষা একটু আগেই।

সরকার সাহেব তখনো অফিসে আসেননি। চন্দ্রাও তেমনি অবস্থাই মনে মনে চেয়েছিল। একখানি চিঠি সরকার সাহেবের টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রেখে চন্দ্রা সেই যে বাড়ি ফিরে আসে, আর যায়নি অফিসমুখো।

এদিকে প্রেস কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়ে গেছে কাগজে কাগজে। সাংবাদিকদের মধ্যে এ নিয়ে মোটামুটি একটা উল্লাসের ভাব দেখা গেলেও গরীব প্রুফ রীডার অর্থাৎ ভ্রম-সংশোধক মহলে কিন্তু গভীর মনোবেদনা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে এ রিপোর্ট। তাদের সম্বন্ধে তেমন কোন উল্লেখই নেই রিপোর্টে।

প্রেস কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনায় দিল্লী সরগরম। এক দিকে মালিকদের এবং আর এক দিকে সাংবাদিক কর্মীদের বৈঠক বসছে পর পর। এই সাংবাদিক কর্মীদের আলোচনায় যোগ দেবার জন্যে কোলকাতা থেকে এসেছেন কয়েকজন প্রতিনিধি। দু'জন উঠেছেন নয়াদিল্লীর কালীবাড়িতে।

কালীবাড়ি দিল্লীতে বাঙালীদের একমাত্র মিলনকেন্দ্র।

কোলাহল-বিরল পরিবেশে এ বাড়িতে বেশ ভালই লাগছে নন্দদুলাল ও সমীরণের। তবে কতোটুকু সময়ই বা আর তাঁরা এখানে থাকবার অবকাশ পান? প্রেস কমিশনের সুপারিশ আলোচনার কাজ যদিও বা শেষ হলো তো নেমন্তন্নের ধাক্কায় অস্থির একেবারে। এমন কি পাশের বিড়লা মন্দিরটা পর্যন্ত একবার ঘুরে ফিরে দেখার সময় করা যায়নি গত চার দিনের মধ্যে! বিড়লা মন্দিরেরই আর এক পাশে মহাসভা ভবনটাও দেখার মতো।

সমীরণ নতুন এসেছেন দিল্লীতে। কিন্তু নতুন এলেও এরই মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে তিনি রাজধানীর প্রায় যাবতীয় দ্রষ্টব্যই দেখে নিয়েছেন এ কয়দিনের মধ্যে। লালকেল্লা, কুতুবমিনার, ফিরোজ শা কোটলা, হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ, রাজঘাট এসব কিছুই আর প্রায় বাকি নেই, বাকি শুধু অতি কাছের এই বিড়লা মন্দির আর মহাসভা ভবন। সেদিন সন্ধ্যায়ই এ দুটো দ্রষ্টব্য দেখা শেষ করে দেখার পালা মিটিয়ে ফেলবেন স্থির করেছেন সমীরণ।

সেদিনই আর সব কাজ সেরে এসে সন্ধ্যায় বিড়লা মন্দিরে বেড়াতে যেয়ে বিস্মিত বোধ করেন সমীরণ এই মন্দির নির্মাণে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ভেবে। কিন্তু নির্মাণকর্তার নাম মনে আসতেই বিস্ময়ের ঘোর কেটে যায় তাঁর। বিড়লার কাছে এ ব্যয় আর কতোটুকু!

আচ্ছা, শুভেন্দুর মতো মনে হচ্ছে না? কিন্তু শুভেন্দু হলে তার সঙ্গে এ অবাঙালী মেয়েটি এসে জুটবে কোত্থেকে? আর তাছাড়া সে তো পাটনায় কাজ করছে শুনেছিলাম। রাজঘাট থেকে ফেরবার পথে পরশু দিনও যেন এরাই চোখে পড়েছিল। সন্ধ্যার আব্‌ছা আঁধারে তারুণ্যের একটু বাড়াবাড়ি পরিচয় দিয়েই চলছিল তারা। কিন্তু শুভেন্দুর কথা মনে হয়নি তখন। আর হঠাৎ দিল্লীতেই বা তার আবির্ভাব ঘটবে কেন? সেদিনও তো কোলকাতায় চন্দ্রার সঙ্গে বাসে দেখা হলো, কই সে তো বল্লে না কিছু!—বিড়লা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার মুখে মন্দিরগামী এক জোড়া হাস্যোচ্ছল তরুণ-তরুণীকে দেখে কেমন যেন ভাবিত হয়ে পড়েন সমীরণ সেন।

বেশ তো দেখাই যাক্‌না, আরো একদিন তো থাকাই হবে দিল্লীতে। সমীরণ ব্যাপারটাকে ভালো করে যাচাই করেই দেখতে চান।

পরদিন একটু বেশি রাতেই বিড়লা মন্দিরে বেড়াতে আসেন সমীরণ সেন। সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন প্রত্যেকটি মানুষের আসা যাওয়া। পূর্ব সন্ধ্যায় যে হলঘরে বসে মীরার একখানি অপূর্ব ভজনগান তিনি শুনছিলেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো, সেখান থেকেই তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠের ধ্বনি ভেসে আসছিল সেদিন। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি অনেকক্ষণ ধরে শুনছিলেন সেই রামায়ণ গান। কিন্তু হঠাৎ তাঁর তন্ময়তা ভেঙে যায়ঃ

হ্যাঁ। শুভেন্দুই তো বটে!—এই কথা বলেই দু'পা এগিয়ে এসে শুভেন্দুকে অবাক করে দেন সমীরণ।

কে, সমীরণদা যে? আপনি এখানে হঠাৎ, কী ব্যাপার!

তুমি এখানে কদিন, তাই আগে বলো শুনি। কী কর আজকাল?

এখানে একটা খবরের কাগজের অফিসে কাজ নিয়েছি

সমীরণদা। তা প্রায় ছ'মাস হলো আছি রাজধানীতে। কিন্তু একি আর আমাদের মতো লোকের থাকার জায়গা? আগে শুনেছিলাম প্রেস কমিশনের সুপারিশে কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন তো দেখছি প্রুফ রীডাররা বাদ পড়ে গেছে তা থেকে। ব্যস্, সব আশা নির্মূল! অথচ শুনেছি অনেকে বড়ো বড়ো কাগজের সম্পাদকও হয়ে গেছেন প্রুফ রীডার হিসেবে সংবাদিকতায় হাতে খড়ি দিয়ে।

ও, তুমি প্রুফ রীডারি করছো বুঝি। কিন্তু একাজের জন্যে তোমার কোলকাতা ছেড়ে দিল্লী আসার কী এমন দরকার ছিল শুনি। তুমি বলছো, চাকরি করছো। কিন্তু ওদিকে তো দেখছি, চন্দ্রাকে অফিসের কাজে নামতে হয়েছে। চন্দ্রার অশেষদা তাকে অফিসে নিয়ে যায়, নিয়ে আসে—সে খবর তুমি রাখো কিছু?

চন্দ্রা অফিসে যায়?—শুভেন্দু যেন চমকে ওঠে চন্দ্রার চাকরির কথা শুনে।

বারে, যাবে না! সবশুদ্ধু না খেয়ে মরবে তারা? এ কি কথা বলছো তুমি শুভেন্দু? তুমি রাজধানীতে স্ফূর্তি লুটবে আর ওরা সব শুকিয়ে থাকবে কোলকাতায়, তাই বলতে চাও তুমি?

তা কেন হবে সমীরণদা! আমি তো প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই একশোটাকা পাঠিয়ে দিয়েছি চন্দ্রাকে।

ব্যস্, তাতেই হয়ে গেল!

ছ'মাস পাটনায় প্রুফ রীডারি করে যা পেয়েছি তা থেকে কিছুই পাঠাবার উপায় ছিল না। জানি সে সময়টা ওদের খুবই কষ্টে কেটেছে।

তবে! খিদের কষ্ট কতোকাল সইতে পারে মানুষ?

তাইতো চন্দ্রা নিজে কোন একটা কাজে নামতে চাইলে তাকে অনুমতিও দিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে এসে আমার

এ কাজটা জুটে যাবার পর আমি তাকে নিষেধ করেই চিঠি দিয়েছি কোন চাকরি নিতে।

কিন্তু তার আগেই তো সে কাজ নিয়ে বসে আছে।

সংসারের খাটাখাটুনির পর আফিসের পরিশ্রম তার সইবে কেন, বিশেষ করে তা ভেবেই আমি তাকে বারণ করেছিলাম। আমার বারণ সত্ত্বেও কাজে যায় চন্দ্রা। অশেষদাই তার বেশি হলো ?

হবেই বা না কেন ? এ মেয়েটিই বা তোমার কাছে বেশি হলো কি করে চন্দ্রার চেয়ে ? কে এই মেয়েটি শুনি।—সমীরণের এই আকস্মিক কঠোর প্রশ্নে মুহূর্তের মধ্যে একটা কালোছায়ার আবরণে ছেয়ে যায় শুভেন্দুর সারা মুখখানি।

এর কথা বলছেন সমীরণদা, এ আমারই এক সহকর্মী বন্ধুর বোন। এদের বাড়িতেই আমি একমাস হলো পেয়িং গেষ্ট হয়ে আছি। সিন্ধী হলেও আমাকে এরা একেবারে নিজেদের লোক করে নিয়েছে।—সমস্ত সংকোচ ও লজ্জাকে চেপে রেখে অতি কষ্টে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা উত্তর দেয় বটে শুভেন্দু, কিন্তু এর ঘোল আনাটাই যে ফাঁকি এ কথা বুঝতে বাকি থাকে না সমীরণের।

কিন্তু ভায়া, হোষ্টের ঘরের তরুণী মেয়েকে নিয়ে পেয়িং গেষ্টের এতো রাত অবধি বাইরে বাইরে কি রোজ রোজ ঘোরাফেরাটা ভালো দেখায় ? আচ্ছা, পরশু সন্ধ্যায় রাজঘাটের সামনে তোমাদের মতোই দুজনকে দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। তখন খেয়াল হয় নি। কিন্তু এখন ভাবছি তোমরাই। সত্যি কি তাই ?

হবে হয়তো। পরশু গিয়েছিলাম আমরা রাজঘাটে বেড়াতে।—মাথা নীচু করে সসংকোচে জবাব দেয় শুভেন্দু।

রাজধানীতে লাজলজ্জার বালাই নেই বুঝি ! একেবারে প্রকাশ্য রাস্তায় তীর্থপথে বন্ধুর বোনকে নিয়ে···। যাক্‌গে,

তবে চন্দ্রা বেচারাকে একেবারে ভুলে যেও না যেন।—সমীরণের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে যেন আর বেশি কথা বল্‌তে। তিনি হন্ হন্ করে বেরিয়ে যান বিড়লা মন্দির থেকে এবং মনে মনে এও ঠিক করে ফেলেন যে, কোলকাতায় ফিরেই চন্দ্রাকেও এ ব্যাপারে একটু সতর্ক করে দেবেন।

সমীরণের সঙ্গে এমনি আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যাবে এ কখনো কল্পনা করতে পারে নি শুভেন্দু। কী ভীষণ লজ্জার কথা! বিশেষ করে সুন্দরী সঙ্গে থাকাতেই সে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেছে। তাছাড়া পরশুর ব্যাপারটাও সমীরণের চোখে পড়েছে। রাজঘাটের সামনে সেদিন সে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছিল। রাজঘাট থেকে বেড়িয়ে ফেরবার পথে সামনের ফুলওয়ালার কাছ থেকে একগোছা ফুল কিনে বুকে করে নিয়ে চলছিল সুন্দরী। ফুলে ফুলময় সুন্দরীর বুকের দিকে চেয়ে অধীর হয়ে উঠেছিল শুভেন্দু। সেই ফুলদলে দোল খেতে উন্মুখ হয়ে উঠলো তার মন। মুহূর্তের উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে সুন্দরীর বুকে। শুভেন্দু কী করে জানবে সে মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত থাকবে তার সমীরণদা!

শুভেন্দুর দাদা ছিলেন সমীরণের অন্তরংগ বন্ধু। গাঁয়ের স্কুলে পড়ার সময় বাইরের লোকেরা কখনো সমীরণকে অন্য বাড়ির ছেলে বলে মনে করতে পারতো না। কুষ্টিয়া থেকে কোলকাতায় এসেও তারা একই পাড়ার অধিবাসী। তহবিল তছরুপের মিথ্যে অভিযোগে শুভেন্দুর ব্যাংকের চাকরিটা চলে যাবার পর প্রথম সহানুভূতি ও সাহায্য এসেছিল সমীরণের কাছ থেকেই। এ ব্যাপারে শুভেন্দুর জন্যে দৌড়োদৌড়িও সমীরণ কম করেন নি। তবে টাকা

পয়সা দিয়ে বেশিদিন সাহায্য করার সামর্থ্য তাঁরই বা কতোটুকু ! সে ব্যাপারে অশেষকুমারের সাহায্যই যে প্রধান সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের কাছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

সমীরণের কাছে চন্দ্রার চাকরির কথা, বিশেষ করে অশেষকুমারের সঙ্গে তার অফিসে যাওয়া আসার কথা শুনে শুভেন্দুর মনে বেশ একটু খটকা লেগে যায়। সেদিন সারা রাত ধরে সে চন্দ্রার কথাই চিন্তা করে, আর চন্দ্রার চিন্তার পাশাপাশি সুন্দরীর ছবিও যেন তার চোখের সামনে ভেসে ভেসে ওঠে।

সত্যি, সুন্দরীর সঙ্গে এতোটা গভীর ভাবে মেলামেশা করা ঠিক হয় নি। কে জানে, সুন্দরীর সঙ্গে এই মেলামেশার খবর কোনরকমে শুন্‌তে পেয়েই চন্দ্রা তার অশেষদার প্রতি এতোখানি আসক্ত হয়ে পড়েছে কিনা। সুন্দরীর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া খুবই মুস্কিল, তবু সেখান থেকে মুক্ত হয়ে আসতেই হবে তাকে। তা না হলে অশেষকুমারের হাত থেকে চন্দ্রাকেও মুক্ত করা যাবে না।

এমনি সব চিন্তা কেবলি কিল্‌বিল্‌ করতে থাকে শুভেন্দুর মাথায়।

সমীরণদা যদি কোলকাতায় ফিরেই সব কথা বলে দেয় চন্দ্রাকে, তাহলে কী ভাববে সে ? কবে যে সমীরণদা কোলকাতা রওনা হবেন তাও তো জিগ্যেস করা হয়নি তাঁকে।—শুভেন্দু যে এ অবস্থায় কী করবে তা ভেবে পায় না। তাই সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে মনে মনে।

না, আর চিন্তা নয়। পরদিনই শুভেন্দু তার অন্ধ ও পীড়িত পিতাকে দেখবার অজুহাতে সাতদিনের ছুটি নিয়ে কোলকাতা যাত্রা করে। কোলকাতার বাড়িতে পৌঁছেই চন্দ্রাকে তার প্রথম প্রশ্ন :

কি, আফিসের কাজকর্ম চলছে কেমন চন্দ্রাদেবী ?

চন্দ্রার বুঝতে বাকি থাকে না শুভেন্দু তার এ প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে কি ইংগিত করতে চায়। মুখের কথায় উত্তর না দিয়ে শুধু একখানা চিঠি এগিয়ে দেয় শুভেন্দুর হাতে। মাত্র দুঘণ্টা আগে পাওয়া সেই চিঠিখানা।

গভীর আগ্রহ নিয়ে শুভেন্দু খাম থেকে খুলে পড়তে সুরু করে চিঠিখানি। অশেষকুমার লিখেছে—

চন্দ্রা,

তুমি আমাকে না জানিয়েই পদত্যাগ করেছ, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু সেদিন সরকার সাহেবের আমন্ত্রণ নিতান্ত অভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং তারপর তোমাদের বাড়িতে আমাকে যথেচ্ছভাবে অপমান করে তুমি যে অবস্থার সৃষ্টি করেছ, তারপর তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোনরকম সম্পর্ক রাখা চলে না। তোমার পদত্যাগপত্র সরকার সাহেব সানন্দেই গ্রহণ করেছেন। এই সঙ্গে তাঁর পত্র এবং কোম্পানী থেকে তোমার প্রাপ্য অর্থ পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

তোমার ভালোমন্দ তুমিই বুঝবে। আমার দায় এখানেই শেষ।

ইতি,

অশেষকুমার

চিঠিখানা পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে শুভেন্দু। তার প্রতি চন্দ্রার অনুরাগের পরিমাপ করতে পারে না সে। চন্দ্রাকে গভীর উত্তপ্ত আলিংগনে বেঁধে নিতে গিয়ে কেমন যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে শুভেন্দু। সুন্দরীর কথা মনে পড়তেই লজ্জায় ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে তার সারা দেহ। সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সুন্দরীর চিন্তা। তার মনের ওপর সাময়িক ভাবে একটা মোহ বিস্তার করেছিল সুন্দরী, তার নবযৌবনের তরংগে ভাসিয়ে নিতে

চেয়েছিল তাকে। কিন্তু প্রথম তরংগাঘাতেই সে নিরাপদ তীরে এসে ছিটকে পড়েছে।

চন্দ্রা শুভেন্দুকে কাছে টেনে নিয়ে শান্ত করতে চায় তার উত্তেজনাকে। কিন্তু তার অন্তরের কথা কি করে জানবে সে ?

কয়েক দিন পর সমীরণ আগ্রা এলাহাবাদ বেনারস হয়ে কোলকাতায় ফিরে এসে যখন চন্দ্রাদের খোঁজ করতে এলেন, তখন দেখেন সেখানে শুভেন্দুও উপস্থিত।

গ্রন্থি

সন্ধ্যার আকাশে তারা ঝিক্‌মিক্। শান্ত নদীর জলে তারই ছায়া। অনেক আশার আলো ঝল্‌মল্ যেন।

তার জন্যে তুমি ভেবো না বিনতা।—গংগার ঘাটে বেড়াতে বেড়াতে বৌদি আশ্বাস দেন তাঁর ননদকে।

বয়সের পার্থক্য অনেক বেশি হলেও ভাব কিন্তু খুবই গভীর বৌদি-ননদিনীর মধ্যে। তাই ওদের একজনের কোন কথাই আর একজনের অজানা থাকে না।

তা ছাড়া একই পার্টির কর্মী ওরা। পূরবীদি পার্টির নেত্রীস্থানীয়া। তাঁরই রেক্রুট বিনতা। কিন্তু তবু কেন জানি পুরোপুরি নির্ভর করতে পারছে না বিনতা তার বৌদির কথার ওপর।

বিনতা যে আশংকা করছে তা একেবারে অমূলকও নয়। তার বৌদি পার্টির পূরবীদি। পার্টির লোকেরা তাঁর কথামতো চলে তিনি তার নেত্রী বলে। কিন্তু সংসারের ব্যাপারে দাদার কথাই তো চরম কথা, বৌদির কথা সেখানে নাও থাকতে পারে।

তবে বৌদির কথাই যে বেশি থাকে এও অবশ্য বিনতা লক্ষ্য করে আসছে। তাইতো সে তার মনের কথা খুলে বলেছে বৌদিকে এবং তাঁর কাছে জানিয়েছে তার আবেদন।

কাল একটুও ঘুমুতে পারি নি বৌদি! আজও হয়তো তেমনি ভাবে না ঘুমিয়েই রাত কাটবে।—দুশ্চিন্তার গভীরতা প্রকাশ পায় বিনতার কথায়।

বেশ আজই তোমার দাদার সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করবো।

তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। শুধু শুধু কেন এজন্যে মাথা খারাপ করছো বিনতা!

দেখো ভুলে যেও না আবার। তোমার তো আবার সাত রকমের ঝামেলা।—বিনতা অনেকটা আশ্বস্ত হয়েই বলে।

হ্যাঁ ভালো কথা, আসছে কাল আবার মহিলা সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক অনুষ্ঠান। তোমার আর বীথিকার গান গাইবার কথা। সন্ধ্যা করবে আবৃত্তি। চলো ফেরার পথে বীথিকাকে একবার ভালো করে বলেই যাই। সে আবার ভুল না করে বসে!

খুব অসম্ভবও নয়। এরই মধ্যে কেমন যেন হয়ে গেছে বীথিকা। ছ মাসের মধ্যে তার সঙ্গে তো দেখাই হয় নি। বিয়ের পর পরিষদের কটা মিটিং-এই বা সে আসতে পেরেছে? —সংসার পেতে বসবার পর বীথিকার মধ্যে যে বেশ একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তাই সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করে বিনতা।

তা প্রথম প্রথম এরকম একটু আধটু হয়েই থাকে। এ থেকে প্রমাণ হয় না যে, বীথিকার আর কোন আকর্ষণই নেই আমাদের পরিষদের ওপর। তা ছাড়া হঠাৎ কাজের চাপও তো পড়ে যেতে পারে, ভুল-চুকও হতে পারে।

সে তো সকলের বেলাতেই হতে পারে।—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় বিনতা।

বীথিকার পক্ষ নিয়েই যে কথা বলবেন বৌদি সে তার জানাই ছিল। আর বীথিকার ওপর পরিষদ-সভানেত্রীর পার্শিয়ালিটি যে আজকের নয়, অনেক দিনের, সে কথা পার্টির কেই বা না জানে? তা নইলে প্রতাপ রায়ের মতো ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হতে পারতো কখনো? সে যা হয় হোকগে। যে হাতছাড়া হয়ে গেছে তাকে নিয়ে তার চিন্তা

করে লাভ নেই। সন্দীপন আবার ফস্কে না যায় তাই এখন দেখা দরকার।

বিনতার যা কিছু চিন্তা তা শুধু এই নিয়ে। প্রতাপের সঙ্গে তারই প্রথম খুব ভাব জমে ওঠে। গানে অবশ্যি বীথিকার নাম বেশি তার চেয়ে। কিন্তু দেখতে? বুকে পিঠে কোন তফাৎ ছিল ওর? ক'খানা হাড় দিয়ে তৈরি মানুষ! তবে প্রতাপ যদি আর সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু গানের দিকেই বেশি ঝুঁকে থাকতো তা হলে আর কিছু বলার ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা তো শুধু তাই নয়। সভানেত্রী যা চেয়েছিলেন, তাই হয়েছে।

সত্যি অদ্ভুত শক্তি তার বৌদির। গত কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করে আসছে বিনতা। তাকেও তো পূরবীই পার্টিতে এনেছেন। তা না হলে এমনি করে বাইরে ঘোরাফেরা করার সুযোগ পেতো কোনদিন সে জীবনে! তার দাদা আনন্দকুমার শিক্ষা-দীক্ষায় যতোই উন্নত হোন না কেন, তাঁর মনোভাবকে ঠিক আধুনিক বলা চলে না। ভাগ্যি পূরবী বৌদি এসেছিলেন তাদের ঘরে, তা না হলে কী অবস্থাটাই না জানি হতো!

পূরবীদি, এখানে কী করছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?—হঠাৎ সন্দীপনের ডাক শুনে চমকে ওঠেন পূরবী। বিনতাও।

আপনি?

ওপার থেকে এইতো সবে এলাম। বালী আর বেলুড়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটা নাইট স্কুল ষ্টার্ট করার সব ব্যবস্থা আজ ঠিক হলো।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আসছে সপ্তাহ থেকেই স্কুল বসবে। আমাদের পার্টির কাজ খুব ভালোই চলবে এখান থেকে আশা করি।

খুব ভালো কথা, খুব ভালো কথা। দেশের বাস্তব অবস্থার দিকে যদি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ফেরাতে হয় তা হলে আমাদের আরো জোরের সঙ্গে কাজ না চালালে চলবে না। এই দেখুন না, একদিকে কীর্তনের আসর, আর একদিকে ভাগবত-পাঠের বৈঠক কেমন জমে উঠেছে। লক্ষ্য করছেন তো, শুধু বুড়ো-বুড়ীরাই নয়, অল্পবয়সী সব ছেলেমেয়েরাও এদিকে কেমন ঝুঁকে পড়ছে!—সন্দীপনকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেন পূরবীদি।

কিন্তু আপনারাও তো খুব মন দিয়েই কীর্তন গান শুনছিলেন মনে হচ্ছিল।—সন্দীপন বিনতার দিকে তাকান এই বলে।

না, আমি গান-টান কিছু শুনছিলাম না।—বিনতা ছোট্ট উত্তর দেয়।

নিশ্চয়ই না, বিনতা নিজের কথাই শুধু ভাবছিল।

আর আপনি?—বৌদির কথায় একটু লজ্জা পেয়ে কোন রকম চিন্তা ভাবনা না করেই একটা পাল্টা প্রশ্ন করে বসে বিনতা।

ভক্তির ভান ও ভণ্ডামি থেকে এসব ছেলেমেয়েদের মুক্ত করে কী করে বৃহত্তর মানবতার সেবায় এদের নিয়োগ করা যায় আমি সে কথাই ভাবছিলাম।—পূরবী উত্তর দেন।

কিন্তু এ খুব সহজ কাজ নয় পূরবীদি। এদেশের মানুষের মনের গভীরে, তার রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় ভক্তির বীজ। তাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা ব্যর্থ হবে বলেই আমার মনে হয়। তার চেয়ে অনেক কাল ধরে যে কথকতা, যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যম হিসেবে আমাদের দেশে চালু রয়েছে সেগুলোকে আমরা যদি কাজে লাগাই তাতে ভালো বই মন্দ হবে না।

সন্দীপনের কথাগুলো বেশ মনে লাগে পূরবীদির। বিনতার তো লাগেই। কিন্তু এই কাজে লাগাবার উপায় নিয়েই তো প্রশ্ন। গংগার ঘাটে পায়চারি করতে করতেই সে প্রশ্নটা তোলেন পূরবীদি।

কেন, এখন তো কাল্‌চারাল ফ্রণ্টেই আমাদের আসল কাজ। নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা যতো সহজে সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের কথা প্রচার করতে পারবো আর কোনভাবেই তা সম্ভব হবে না। আর এসব অনুষ্ঠানে বাউল, তরজা, কবিগানের মতো লোক-সংগীত ও লোক-নৃত্যাদি যতো বেশি থাকবে ততো বেশি লোককে আমরা আকর্ষণ করতে পারবো। কী বলেন পূরবীদি?—জিগ্যেস করেন সন্দীপন।

ঠিক কথা।

আর শুনুন। কীর্তনই হোক আর ভাগবত-পাঠই হোক, আমরা যদি এগুলোকেও আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইন্ট্রোডিউস করে নি তাতে আপত্তিরই বা কি কারণ থাকতে পারে? আসল কথা হলো ইন্টারপ্রিটেশন নিয়ে। সে তো আমাদের হাতে। কী বলেন?

নিশ্চয়ই।—পূরবীদি অ্যাপ্রিশিয়েট করেন সন্দীপনের কথা।

চলুন, যাওয়া যাক এবার। আমাদের বাড়ি হয়ে চা খেয়ে যাবেন।—সন্দীপনকে চায়ের আমন্ত্রণ করায় বিনতা মনে মনে খুব খুশি হয় বৌদির ওপর।

বৌদি, বীথিকাদের বাড়ি আজ আর নাই বা গেলে!—এখানে ওখানে গিয়ে সময় আর নষ্ট করতে চায় না বিনতা।

কী যে পাগলী মেয়ে, সন্দীপনবাবুকে পেয়ে আর তর সইছে না যেন।

এ আবার কী বলছেন পূরবীদি?

তা নয় তো কি। বিনতা ভাবছে, বীথিকাদের বাড়ি গেলে আপনার সঙ্গে ওর গল্প করার সময় অনেকখানি নষ্ট হয়ে যাবে। আর জানেন না তো শ্রীমতী যে কী দুশ্চিন্তায় পড়েছে! ওর দাদা এবার বোনের বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছেন। উপযুক্ত পাত্রেরও নাকি সন্ধান সুরু হয়ে গেছে। কিন্তু শ্রীমতীর মন যে কাকে উপযুক্ত পাত্র বলে বেছে নিয়েছে ওর দাদা না জানলেও আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন।

না, সে আবার কে?

কেন, শ্রীযুক্ত সন্দীপনচন্দ্র চন্দ। তাঁকে চেনেন না আপনি!—এই বলে হেসে ফেলেন পূরবী চ্যাটার্জি। বিনতাও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মুচকি হাসে।

ঐ দেখছেন পূরবীদি, কেমন একমনে নৌকোর মাঝি-মাল্লারা পর্যন্ত কীর্তন গান শুনছে।—কথার মোড় ঘুরিয়ে এক সারি খড়বোঝাই নৌকোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সন্দীপন।

প্রায়ই এমনি সারি সারি খড়ের নৌকো ভিড় করে থাকে বাগবাজারের ঘাটে। সন্ধ্যার সময় মাঝি-মাল্লারা নৌকোবোঝাই খড়ের গাদার ওপর বেশ আঁটসাট হয়ে বসে বিশ্রাম করে, তামাক খায় আর এমনি গান-বাজনা শোনে। কীর্তন-জাতীয় গানে তো এরা একেবারে মেতে যায়।

সন্দীপনের কথায় পূরবী ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখেন মাঝিদের দিকে। মাঝিরা কেউ হুঁকো টানছে। কেউ বা বিড়ি। এক একটা করে লণ্ঠন জ্বলছে এক এক নৌকোয় তাদের সামনে। কীর্তনের সুরে আর কীর্তনের কথায় তারা যে কেমন মেতে উঠেছে তা তাদের মুখভঙ্গিতেই ধরা পড়ে ঐ লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয়।

ততক্ষণে গংগার ঘাট থেকে ওঁরা বাগবাজার ষ্ট্রীটে এসে পড়েছেন। পথে যেন আর পা ফেলার জায়গা নেই। এমনি

ভিড়। কালী, শীতলা, শনি প্রভৃতি নানা ঠাকুর-দেবতার মূর্তি নিয়ে বসেছে এক একজন পূজারী। আর সে সব মূর্তির সামনে জমেছে অসহায় মানুষের ভিড়। কিন্তু অসহায়তার এই যে আর্তি আর আকূতি তার কি কোন প্রতিকার সম্ভব এ ধরণের কর্মহীন নিরর্থক প্রার্থনায়? আর পূজার নামে এই দোকানদারিই বা কতো কাল চলবে?

পূরবী বিরক্তি প্রকাশ করেন পথ এগোতে এগোতে আর এসব প্রশ্ন করেন কখনো আপন মনে কখনো বা প্রকাশ্যে সন্দীপনকে।

ভক্তির দেশ এই ভারতবর্ষ থেকে একদিনে এসব কুসংস্কার দূর করা যাবে না, পূরবীদি! এর জন্যে চাই ব্যাপক শিক্ষার প্রসার, চাই প্রচুর পরিশ্রম, পরিকল্পনা আর অর্থ। এদের ওপর বিরক্ত হয়ে কি লাভ?—সন্দীপন উত্তর দেন।

এমনি সব আলোচনা করতে করতে বাগবাজার ষ্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলেন ওঁরা তিন জন।

এ যে অবাক কাণ্ড! বীথিকা আর প্রতাপ নয়?—দূর থেকে এক শাঁখারির দোকানের সামনে এক দম্পতিকে লক্ষ্য করে বিনতাকে জিগ্যেস করেন পূরবী।

হ্যাঁ, তাইতো!

এতে অবাক হবার কী আছে পূরবীদি?

একটু আছে বৈকি? সমস্ত রকমের সংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেখেছি যে বীথিকাকে আর প্রতাপকে, তারা কিনা নিজে থেকেই সংস্কারের বলি হয়ে উঠলো!

ততক্ষণে নতুন একজোড়া শাঁখা পরা হয়ে গেছে বীথিকার। প্রতাপ দুটো টাকা বের করে দেয় মনিব্যাগ থেকে তাও চোখে পড়ে।

কিরে বীথিকা, শাঁখা পরা হয়ে গেল ?—পিঠে আকস্মিক মিষ্টি চাপড় আর পূরবীদির কণ্ঠস্বর চমকে দেয় বীথিকাকে।

হ্যাঁ, নইলে শাশুড়ীর তাড়নায় বাড়িতে টেকা দায়।—টিপ করে পূরবীদিকে একটা প্রণাম করে বলে বীথিকা। প্রতাপ হাতজোড় করেই সবাইকে নমস্কার জানায়।

ও তাই নাকি! খুব জোর সংসার করছিস্ তুই তা হলে। তা বেশ। কিন্তু কালকের ফাংশনের কথা যেন ভুলে যেয়ো না। চিঠি পেয়েছ তো ?

হ্যাঁ, পেয়েছি।

তোমার কিন্তু কয়েকখানা গানই গাইতে হবে। বিনতাও গাইবে। ভালোভাবে তৈরি হয়ে নিও। প্রতাপও যাবে, বুঝলে ?

আচ্ছা।

নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি তা হলে। তোমাদের বাড়ির দিকেই আমরা যাচ্ছিলাম তোমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে কালকের অনুষ্ঠানের কথা। পথে দেখা হয়ে ভালোই হলো।—এই বলে পূরবী বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেন সদলে আর বীথিকারা এগোয় গংগার দিকে।

ওরা একটু দেরি করেই বেড়াতে বেরিয়েছে। পথে শাঁখা কিনতেও বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল।

হাতে নতুন শাঁখা, কপালে এই বড়ো সিঁদুরের ফোঁটা, বীথিকাকে বেশ মানিয়েছে কিন্তু বৌদি!—বিনতা হঠাৎ একটা মন্তব্য করে ফেলে।

পূরবী একটু মুচকি হাসেন সন্দীপনের দিকে চেয়ে।

গায়ে গতরে আজকাল বীথিকার যেন একটু মাংসও দেখা দিয়েছে। তাই না বৌদি ?

তা তোমারও হবে। আর কটা দিন একটু সবুর করো।
—সন্দীপনকে শুনিয়ে শুনিয়েই জবাব দেন পূরবী।

তারপর কথায় কথায় ওঁরা যখন বাড়িতে ফিরে আসেন তখন রাত আটটা দশ।

শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকের গলিতে পূরবীদের ভাড়া বাড়ি। নীচের তলার দেড়খানা ঘরের ভাড়াটে ওঁরা। ভাড়া চল্লিশ টাকা।

দেড়খানা ঘর বল্লে চটে যান ভবানন্দ বাঁড়ুয্যে। তিনি বাড়িওয়ালা। থাকেন ওপরতলায়। তিনি বলেন, দেড়খানা ঘর বল্লে চলবে কেন, সঙ্গে এক চিল্‌তে রান্নাঘর রয়েছে, সিঁড়ির তলায় ঘুঁটে কয়লার জায়গা দেওয়া হয়েছে, তার কোন দাম নেই বুঝি?

ভাড়াটেরা ন্যায্য কথা বলে না, এই ভবানন্দর অভিযোগ।

কিন্তু অভিযোগ যাই থাক্, এ নিয়ে আনন্দকুমারের সঙ্গে কখনো কোন বিরোধ হয় নি বাড়িওয়ালার। আনন্দকুমার নির্বিরোধ মানুষ। অধ্যাপক। একটা ইভনিং কলেজে অধ্যাপনা আর গোটা দুই ট্যুইশানি করে বাইরের কোন ঝামেলায় জড়াবার মতো সময়ও আর থাকে না তাঁর। একটি মাত্র ছেলে। বছর সাত আট তার বয়েস। কার্শিয়াং স্কুলে বোর্ডিং-এ রেখে পড়াতে তার পেছনেই প্রায় শ দেড়েক টাকা খরচ। তবু ভালো, ছেলেটা মানুষ হবে। সেজন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন আনন্দকুমার আর কোন দিকে লক্ষ্য না করে।

এই একটি ছেলেই যাতে ভালোভাবে মানুষ হয়ে উঠতে পারে পূরবীও আর দ্বিতীয় সন্তান চান নি সেজন্যে। আর হয়ও নি। খুবই সাবধান ওঁরা।

কলেজ থেকে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় এগারোটা হয়ে যায় আনন্দকুমারের। এক একদিন তার চেয়েও দেরি হয় পূরবীর। বিনতাও থাকে তার বৌদিরই সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ি পাহারায় থাকে কমলা ঝি।

সেদিন কিন্তু আনন্দকুমার একটু আগেই এসে পড়েন। সবেমাত্র আড্ডা ভেঙেছে বাড়ির। বিদায় নেবার উদ্যোগ করছেন সন্দীপন। গল্পে গল্পে গরম হয়ে উঠেছে যেন বাড়ির আবহাওয়া।

বসুন।—সন্দীপনকে উঠতে দেখে অভ্যর্থনা জানান সদ্য আগত গৃহকর্তা। তিনি তো আর জানেন না কতোক্ষণ সন্দীপন বসে আছেন এখানে। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য চোখে পড়ে চায়ের কাপ আর খাবারের ডিস। অমলেটের টুকরোর ওপর মাছি উড়ছে ভন্ ভন্ করে। দাদার পায়ের শব্দ পেয়ে বিনতা হাতের পাখাটা খাটের উপর রাখতেই মাছির ঝাঁক এসে মহোৎসব স্বরু করে দিয়েছে প্লেটের ওপর।

না আমি যাই এখন, অনেক রাত হয়ে গেছে। নমস্কার। —এই বলে সন্দীপন বিদায় নেন আনন্দকুমারের কাছ থেকে।

গেটের আলোটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেছে সন্দীপনদা। একটু দাঁড়ান, আমি যেয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে আসছি।—বিনতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় এই বলে।

না না, আমি নিজেই ঠিক চলে যেতে পারবো। তোমার আবার কষ্ট করতে হবে না এই নিয়ে।—বল্‌তে বল্‌তে অন্ধকার পথেই পা বাড়ান সন্দীপন। কিন্তু অন্ধকারে তাঁর নিজের চোখের আলোতেই যেন ধরা পড়ে, বিনতা এক ছুটে দরজার পাশে যেয়ে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

কালকে আমাদের অনুষ্ঠানে নিশ্চয় আসবেন কিন্তু

সন্দীপনদা !—গেটের দরজাটা খুলে দিতে দিতে সন্দীপনকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানাতে ভুল করে না বিনতা। সে নিজেও যে গান গাইবে তাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

নিশ্চয় আসবো।—এই বলে বিনতাকে ছোট্ট একটু আদর করে বেরিয়ে যান সন্দীপন।

কী মধুর স্পর্শ! সে আদরে বিদ্যুৎ খেলে যায় বিনতার সারা দেহে। মনেও।

গলি তখন নিস্তব্ধ। রাজপথ জনবিরল।

গেট বন্ধ করে দিয়ে ঘরে ঢুকে দাদাকে যেন অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশিই গম্ভীর দেখতে পায় বিনতা।

দাদা, তুমি খাবে এখন ?

দাও।—ছোট্ট জবাব।

ডাল, ডিমের বড়া আর ভাত। এই তো খাওয়া। মাসের মাঝামাঝি এসে গেলে এর চেয়ে বেশি কিছু আর বড়ো একটা জোটেও না। তবে সেসব নিয়ে আনন্দকুমার মাথা ঘামান না কোনদিন। কিন্তু চাঁদার কথা শুনে শুনে তাঁর মাথা গরম হয়ে ওঠে সময় সময়। সেদিনও ঠিক তাই হয়েছে।

ছেলের খরচটা পাঠিয়ে দিয়ে বাকি সব টাকাই তো আনন্দকুমার দিয়ে দেন পূরবীর হাতে। সংসার যে ভাবে চলে চলুক তাতে তাঁর কোন আপত্তিই নেই। এ ফণ্ডে, সে ফণ্ডে কোথায় কতো টাকা যাচ্ছে না যাচ্ছে তার কোন হিসেবই তিনি কোনদিন জানতে চান নি। তারপরেও যদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে তাঁর কাছে ভিন্ন করে আবার টাকা চাওয়া হয় তাহলে গুরুগম্ভীর হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কীই বা করবেন আনন্দকুমার? আর যাই হোক ঝগড়া-ঝাঁটি করা যে তাঁর কাজ নয়, এ সবারই জানা।

আর সামান্যই টাকা আছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তা

থেকে কিছুটা খরচ হয়ে যাবেই। বাকি টাকায় মাসের শেষ কটা দিন চালানো অসম্ভব, এটুকুই গৃহকর্তাকে জানাতে চেয়েছিলেন পূরবী। আরো অল্প কিছু টাকা তাই চেয়েছিলেন তাঁর কাছে। তাতেই যে ঘরের আবহাওয়াটা কিছু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তা বুঝতে আর বাকি থাকে না বিনতার।

আরো কয়েকদিন পরের কথা। মাস শেষ হতে আর মাত্র দুটো দিন বাকি।

যথারীতি অনেক রাত্রিতে সেদিনও ক্লান্ত হয়েই ফেরেন আনন্দকুমার। সামান্য বিশ্রামের পর আহারে বসে বেশ কেমন যেন অবাক লাগে তাঁর।

কী ব্যাপার, আজ এতো আয়োজন?

বেশতো খেয়েই নাও না, পরেই না হয় শুনবে।—চিংড়ি মাছের কালিয়ার বাটিটা সামনে এগিয়ে দিয়ে পূরবী হাসতে হাসতে বলেন আনন্দকুমারকে।

আর কিছুর জন্যে নয়, আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি ঘরে যখন এতো অভাব চল্‌ছে সেই মাসের শেষে কী করে তুমি এই বিরাট ব্যবস্থা করলে? কোথায় পেলে এতো টাকা?

বারে, বিনতার আজ বিয়ে হয়ে গেল যে! একটু আনন্দ করবো না বুঝি!

আনন্দে আপত্তি নেই মোটেই, কিন্তু এ ধরণের আনন্দ করতে যে রীতিমতো মালমশলার দরকার, পূরবী!

নাই বা থাকলো টাকা-পয়সা, তা বলে বিয়ে-বাড়িতে একটু বিশেষ আয়োজন হবে না খাওয়াদাওয়ার! তোমার ভগ্নীপতি সন্দীপনচন্দ্রই আজকের এসব খরচপত্র করেছেন।

পূরবীর এ ঘোষণায় কিছুক্ষণের জন্যে যেন তাজ্জব হয়ে থাকেন আনন্দকুমার।

খাওয়া শেষ করে উঠতেই আনন্দকুমার দেখেন, সামনে সন্দীপন আর বিনতা।

বিনতার কপালে বড়ো একটা লাল সিঁদুরের কোঁটা। আনন্দকুমারের আরো বড়ো বড়ো দৃষ্টি গিয়ে পড়ে সেই উজ্জ্বল সিঁদুর চিহ্নের দিকে।

বিনতাকে সত্যি সত্যি আজ বেশ লাগছে কিন্তু দেখতে!

পোকা

হঠাৎ এস্রাজের সুর ক্ষীণ হয়ে আসে।

তারপর কখন যে সে তার কোল থেকে এস্রাজটিকে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে, শুক্লার তা মোটে খেয়ালই নেই। অথচ সুর-সাধনায় বসে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে একেবারে তন্ময় হয়ে ওঠে।

আজও ঠিক তেমনি অবস্থাই হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কেমন একটা বেদনা-কাতর কণ্ঠস্বর সকরুণ ভাবে এসে আঘাত করে শুক্লার হৃদয়তন্ত্রীতে।

সংগীত-তন্ময়তায় আর ডুবে থাকা সম্ভব হয় না তার পক্ষে। দাঁড়িয়ে উঠে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়ে তাতে সমগ্র মেয়ে জাতটার ওপরই কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব এসে যায় তার মনে। বিষিয়ে ওঠে তার সারা অন্তর।

নিঃস্ব মানুষের এমন সকাতর প্রার্থনায় একটুও কেঁদে উঠলো না মায়ের মন ?

আর যে পারি না মা! দে মা দুগণ্ডার পয়সা। এই তো শেষবারের মতো চাওয়া!

একজন নিঃস্ব মানুষের এই আবেদনে এতোটা বিরক্ত হবার কী আছে ধারণাই করতে পারে না শুক্লা। তা ছাড়া যেই হোক না কেন, কোন প্রার্থীর মুখের ওপর এমনিভাবে একটিও কথা না বলে দরজা বন্ধ করে দেওয়াটা যে একটা অভাবনীয় ব্যাপার! অগাধ সম্পত্তির মালিক হলেই কি মানুষকে এমনি করে অপমান করার অধিকার জন্মায়? ও বেচারা তো শুধুমাত্র

প্রার্থনা জানিয়েছিল। কিছু দেওয়া না দেওয়া তো নিজের ইচ্ছে। কিন্তু এটা কি করলেন তপতীবাবুর স্ত্রী? বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বই পড়তে পড়তে হঠাৎ একেবারে ছুটে গিয়ে ধপাস্ করে কবাট বন্ধ করে দেবার মতো কী এমন ঘটলো তা কিছু ভেবেই পায় না শুক্লা। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। তারপর তীব্র বেগে নীচে নেমে আসে দোতলা থেকে। একটা টাকা গুঁজে দেয় অসহায় লোকটির হাতে একেবারে রাস্তায় নেমে এসে।

রাজরাজেশ্বরী হও মা!—আনন্দের আতিশয্যে ছুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে লোকটির। সারা অন্তর দিয়ে সে আশীর্বাদ করে শুক্লাকে।

কি নাম তোমার?—জিগ্যেস করে শুক্লা।

সাধুচরণ।

কোথা থেকে এসেছ তুমি?

চরবেতিয়া!

এমনি সব প্রশ্নের উত্তরে সাধুচরণের পুরোপুরি পরিচয় সংগ্রহ করে নেয় শুক্লা।

উড়িষ্যা-প্রত্যাগত একজন উদ্বাস্তু সে। ক্রমাগত অর্ধাহার অনাহারে নানা রোগে ভুগে ভুগে তার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলেও সাধুচরণ উড়িষ্যার অরণ্য শিবির ত্যাগ করে আসে নি। কিন্তু তার একমাত্র সন্তানের স্মৃতিকে যে সে মূহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। তার স্মৃতির ছায়া চরবেতিয়ার সর্বত্র। তাই সাত বছরের ছেলে সাপের কামড়ে মরবার পর সাধুচরণের পক্ষে আর সেখানে টিকে থাকা সম্ভব হয় নি। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিল সে। সব কিছু বেচে দিয়ে সেখান থেকে সে তাই এই মহানগরীর মাটিতে ফিরে এসেছে। কিন্তু উড়িষ্যার অরণ্য-হিংস্রতার চেয়ে এখানকার আবহাওয়াও তো কম নিষ্করুণ নয়!

তপতীবাবুর স্ত্রীর ব্যবহারের কথা মনে পড়তেই শিউরে ওঠে শুক্লা। তার চেয়ে নোয়াখালির বাজারে তার গুদাম লুঠের সময় যদি সাধুচরণের মৃত্যু ঘটতো হত্যাকারীদের হাতে, তাতেও তো তাকে এতো গ্লানি এতো অবমাননা সহ্য করতে হতো না। শুক্লা চঞ্চল হয়ে ওঠে ভাবতে ভাবতে।

দুর্বল পায়ে সাধুচরণ এগিয়ে চলে শুক্লাকে আশীর্বাদ করতে করতে, কিন্তু যতোক্ষণই তাকে দেখা যায় শুক্লা ততোক্ষণ চেয়েই থাকে তার দিকে। তারপরে ওপরে উঠে আসে ধীরে ধীরে।

তখনো ব্যাডমিণ্টন খেলা পুরোদমেই চলেছে। সন্ধ্যা অবধি রোজই চলে এমনি ধরণের খেলা—ব্যাডমিণ্টন অথবা টেনিস। এর প্রধান উদ্যোক্তা অশোককুমার আর তার বন্ধু অমরনাথ। অশোক শুক্লারই বাপ-মা-মরা মামাত ভাই, তারই সঙ্গে তার বাপ-মার কাছে ছোটবেলা থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে সে। সেই অধিকারেই অশোকের বন্ধু অমরনাথেরও অবাধ আনাগোনা শুক্লাদের বাড়িতে। শুক্লার মাকে অমরনাথও ডাকে পিসিমা বলে অশোকেরই মতো।

অশোক এম. এ. পাশ করে চাকরির তদ্বির করে চলেছে বছরখানেক ধরে।

অমরনাথের পড়ার পিপাসা এখনো যেন মেটে নি। সে আইন পড়ছে ল কলেজে। কিন্তু আইন পড়লেও আইন ব্যবসায় যে তাকে দিয়ে চলবে না, এ কথা সে আগে থেকেই বলে রেখেছে। তার বাবা তার উত্তরে বলেছেন, বেশতো, নাইবা করলে ওকালতি, হাকিম হতে হলেও তো চাই আইনের বিদ্যে। তাই আইনটা সে পড়েই নিচ্ছে।

তা ছাড়া শুক্লাকে খুশি করতে হলে বিদ্যের শেষ শিখরে

যে উঠতেই হবে। শুধু টাকায় ওর মন পাওয়া সম্ভব নয়। তা হলে তো তপতীবাবুর ছেলেই ওর আদর্শ হতো, কিন্তু শুক্লা তো তার দিকে একবার ফিরেও তাকায় না।

ইন্দ্র রায় রোডের নতুন দোতলা বাড়ির দক্ষিণের গা ঘেঁষে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। বিকেল বেলা টেনিস ব্যাডমিন্টন খেলার পাকা আড্ডা। প্রায় আট দশ কাঠা জমি।

শাসমল সাহেবের ইচ্ছে ছিল বাড়ি করার আগে পাশের ঐ জমিটুকুও তিনি কিনে নিয়ে 'আনন্দ নিকেতনে'র জলুস আর একটু বৃদ্ধি করেন। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। জমির মালিক প্রতিবেশী তপতী বাবু। তাঁর হাঁকের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সেই আশায় জলাঞ্জলি দিয়েই তিনি এ বাড়িখানা তৈরি করিয়েছেন।

খুব বেশি বড়ো না হলেও 'আনন্দ নিকেতন' যে এ তল্লাটের একখানা সেরা বাড়ি একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে। মাত্র তিন কাঠার ওপর হলেও মনে হয় যেন তার চেয়ে অনেক বেশি জমি নিয়ে তৈরি হয়েছে এ বাড়ি। ডিজাইনের অভিনবত্বেও 'আনন্দ নিকেতন' দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রত্যেক আগন্তুকের, প্রত্যেক পথচারীর। আর তা হবেই বা না কেন? এতোকালের পুরনো কন্ট্রাক্টর শাসমল সাহেব, প্রাসাদপুরীর আধুনিক অনেক প্রাসাদই যে তাঁর সৃষ্টি। তিনি নিজ বাসভবন নির্মাণে তাঁর অভিজ্ঞতার আর কল্পনার সবটুকু রূপ-রস যে আরোপ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? তার ওপর তাঁর শিল্পী-কন্যা শুক্লার মনের মহিমা-চিহ্নও এ বাড়ির সর্বত্রই চোখে পড়ে।

শুক্লাই শাসমল সাহেবের একমাত্র সন্তান। ছোটবেলা থেকেই যেমনি তার গানের নেশা, তেমনি চিত্র ও মূর্তি শিল্পের প্রতি আকর্ষণ। আর্ট স্কুল থেকে পাশ করার পর গত দুবছর

ধরে আর্টের সাধনায়ই তার দিন কাটে। কিন্তু কোলকাতায় সে যেন এক এক সময় হাঁফিয়ে ওঠে। তার বাবার মতেই সে এতোকাল মত দিয়েছে, কোলকাতায় যখন মন টেকে না তখন এখানে বাড়ি করে কি হবে। কিন্তু শাসমল-গিন্নীর মত ঠিক তার উল্টো। মন টেকা না টেকার কথা নয়, কোলকাতার বাইরে কোথায় পাবে কালিঘাট আর কোথায় পাবে কালীগংগা ?

এ যুক্তিকে কোন রকমে খণ্ডন করা সম্ভব নয় বলেই শেষ পর্যন্ত বাপ আর মেয়েকে সায় দিতে হয়েছে এ বাড়ি তুলতে। তা হলেও পুরী, দার্জিলিঙ্‌ ও শিলঙ-এর বাড়িতে তারা এখনও বছরে দু'একবার ঘুরে ফিরে আসে।

তবে ইদানিং কিছুকাল ধরে শুক্লার মনটা যেন খুব সায় দিতে চায় না কোলকাতার বাইরে যেতে। অমরনাথকে সংগী পেলে হয়তো মনে কোন আপত্তি দেখা দিত না। কিন্তু সে তো আর মুখ খুলে বলা চলে না। তা ছাড়া কলেজের ছেলে, বল্লেই যে পড়াশুনো ফেলে তাদের সঙ্গে যেতে পারবে তারই বা কি ঠিক আছে। তার বাবাও তো আপত্তি করতে পারেন। পুরী, শিলঙ্‌ বা দার্জিলিঙ্‌-এ তাই নির্দিষ্ট সময়ে শুক্লাকে শেষ পর্যন্ত যেতেই হয় বাপ-মার সঙ্গে।

সত্যি অমরনাথকে খুবই ভালো লাগে শুক্লার। এমন পৌরুষ-দীপ্ত চেহারা, সুগঠিত দেহ এবং কথা বলার এমন সহজ অথচ সবল ভঙ্গি বড়ো একটা চোখে পড়ে না তার।

অমরনাথ তাকে যে ভালোবাসে শুক্লা তা জানে, কিন্তু সে ভালবাসায় যে কোন তোষামুদি বা ন্যাকামি নেই তাও সে লক্ষ্য করেছে। শুক্লার সব গানকেই অমরনাথ 'আহা মরি!' বলে প্রশংসা করে না, তার আঁকা সব ছবি বা তার গড়া সব মূর্তিকেই সে 'চমৎকার' বলে বাহবা দেয় না—সত্যিকারের

সমালোচকের দৃষ্টি নিয়েই সে তার সমস্ত শিল্পের দোষ-ত্রুটি ভালোমন্দ বিচার করে মতামত দেয়। বিশেষ করে সেই জন্যেই গভীর একটা শ্রদ্ধাবোধ জেগেছে শুক্লার মনে অমরনাথের জন্যে।

কিন্তু আজ তার হঠাৎ এতোটা আনমনা হয়ে পড়ার কারণ কি? খেলা শেষ করে এসে অশোক আর অমরনাথ শুক্লাকে নিয়ে এক সঙ্গে বসে ওভালটিন আর খাবার খায়, এ তো প্রতিদিনকার বাঁধা সান্ধ্য রুটিন। কখনো তো শুক্লাকে ডেকে আনতে হয় না। সময় মতো সে নিজেই এসে সব কিছু সাজিয়ে রাখে খাবার টেবিলে। আজ তাকে যে শুধু ডেকেই আনতে হলো তা নয়, এসেও সে কেমন নির্বাক নিস্পন্দ!

কী হয়েছে তোমার শুক্লা? শরীরটা খুব খারাপ লাগছে বুঝি!—জিগ্যেস করে অমরনাথ।

না, তেমন কিছু নয়।

নিশ্চয়ই তোমার অসুখ করেছে, নয়তো মন খারাপ হয়েছে কোন কারণে। তুমি চাপতে চাইছো।—শুক্লার উত্তরে খুশি হতে না পেরে অশোক আসল কথাটা বার করার চেষ্টা করে এই বলে।

না, না, ওসব কিছুই নয়।

তবে বলোই না কি হয়েছে। আর যদি শরীর খারাপ লাগে তো চলো ময়দান থেকে একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক।

এর আগে অনেকদিন শুক্লা বিনা ওজর আপত্তিতে অশোক ও অমরনাথের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে গেছে। অমরনাথের গাড়িতেই আবার ফিরে এসেছে। শাসমল সাহেব বা তাঁর স্ত্রীর তরফ থেকেও কোনদিন কোন রকম বাধা আসে নি। কিন্তু আজ শুক্লার মন অমরনাথের অনুরোধেও কিছুতেই বাইরে যেতে চাইছে না। অমরনাথের সঙ্গে বসে গাড়ি দৌড়োতে

গিয়ে হোঁচট খেয়ে পাছে তার কল্পনার ছবি ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এই ভয়।

না অমরনাথদা, আজ নয়, কদিন পরে আমরা কজন মিলে বেশ একটা লঙ্‌ ড্রাইভ দিয়ে আসবো। কেমন?

বেশ, তাই হবে। খাবারটা খেয়ে নাও না, একেবারে হাত তুলেই যে বসে রইলে।

আজ আর কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

তাহলে নিশ্চয়ই তোমার শারীরিক কোন গোলমাল হয়ে থাকবে। সে যাই হোক না কেন, ওভালটিনটা অন্তত খেয়ে নিতে পারো, তাতে ভয়ের কিছু নেই।

অশোকের কথায় ওভালটিনের কাপটা তুলে নেয় শুক্লা।

সেদিনের মতো সান্ধ্য আসর ভেঙে যায়।

যাবার আগে অমরনাথ হঠাৎ বলে ওঠে, আজ তো তোমার এস্রাজের মিঠে আওয়াজও একটু শোনা গেল না, শুক্লা!

তারগুলো ছিঁড়ে গেছে এস্রাজের।—শুক্লার উত্তরে ছেঁড়া তারের এস্রাজের মতোই নীরব হয়ে যায় সবাই।

কয়েকদিন আর আসে নি অমরনাথ। তাকে বাদ দিয়েই খেলা চলেছে। শুক্লার মা জিগ্যেস করেছেন অমরনাথের কথা, কিন্তু শুক্লা নয়। অশোকের কাছে একটু অস্বাভাবিকই মনে হয়েছে ব্যাপারটা।

কিরে, অমরনাথকে কদিন না দেখতে পেয়ে একেবারে ক্ষেপে আছিস্ মনে হচ্ছে।—শুক্লার স্টুডিওতে ঢুকে হঠাৎ প্রশ্ন করে অশোক।

এসব বাজে বকো না অশোকদা, দেখছো- না কাজ করছি।—একাগ্রতাকে ব্যাহত হতে না দিয়ে মূর্তি গড়তে গড়তেই উত্তর দেয় শিল্পী।

ওরে বাপ্‌স্‌!—স্টুডিও থেকে অশোক বেরিয়ে আসতে পথ পায় না যেন। আর্টফার্টের কোন ধার ধারে না সে। হ্যাঁ, খেলা-ধূলোর কথা বলো, তামাম দুনিয়ার খেলার ইতিহাস সে আবৃত্তি করে যাবে। সে বলে, অলসতারই একটা ভদ্র নাম হলো আর্ট—ওসবের মধ্যে নেই আমি।

ভালো কথা। কিন্তু অমরনাথের খবরটা তো নেওয়া দরকার। খুব বেশি দূর-পথের ব্যাপারও নয়। অশোক তাই সদানন্দ রোড থেকে খোঁজ নিয়ে এসে জানায় তার পিসিমাকে। তিনদিনের জন্যে হঠাৎ একটা জরুরী কাজে তার বাবা বাইরে পাঠিয়েছেন অমরনাথকে, সেদিনই তার ফিরে আসার কথা।

অমরনাথ ফিরে এসেছে।

খেলাটা আবার বেশ জমে ওঠে। অমরনাথের অভাবে সত্যি কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল খেলার আড্ডাটা। অশোকের জুটি সেদিন একেবারে ৩-০ গেমেই হেরে যায় অমরনাথের জুটির কাছে। বাইরে থেকে রি-ফ্রেস্‌ড্‌ হয়ে এসে কী দুর্দ্দান্তই না খেল্‌লে সেদিন অমরনাথ!

শুক্লাদের বাড়িতে ওভালটিনের আসরে বসেও সে আলোচনা যেন আর শেষ হতে চায় না। সে আলোচনায় শুক্লার কোন অংশ নেওয়া তো দূরের কথা, নীরব শ্রোতা হিসেবেও সেখানে বেশিক্ষণ সে থাকতে পারে নি। খাওয়া শেষ করেই শুক্লা আসর থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে তার স্টুডিওতে।

কী ব্যাপার বল তো, কোন কিছু নিয়ে মতান্তর হয়েছে নাকি তোমাদের মধ্যে?

না ভাই, তেমন তো কখনও কিছু হয়েছে বলে মনে

পড়ছে না।—অমরনাথের এ উত্তরে অশোক আরো আশ্চর্য হয়ে যায়।

গান-বাজনা হঠাৎ বন্ধ করে দিলি কেন রে শুক্লা, মায়ের এ প্রশ্নের উত্তরে সে জানিয়েছে যে, গান তার থেমে গেছে—মূর্তিগড়ার কাজই এখন তার বেশি ভালো লাগে।

অশোকের কাছ থেকে এ কথাটা শুনে হেসে ফেলে অমরনাথ।

একেবারেই পাগলি হয়ে গেছে দেখছি শুক্লা।

তাতো হতেই হবে ভাই, তোমাদের এ আর্টের পোকা মাথায় ঢুকলে মাথাটা কি আর বেশিদিন ঠিক থাকতে পারে? ওসব আমি কিছু বুঝিনে ভাই। তুমি যাও, গিয়ে দেখে এসো কী সব কাণ্ড-কারখানা চলছে শুক্লাদেবীর স্টুডিওতে। আমি যাই দেখি, ততোক্ষণ একটু বেড়িয়ে আসি।—এই বলে উঠে পড়ে অশোক।

এই যে শুক্লাদেবী, এ যে একেবারে ভাবাবেশ মনে হচ্চে!—অমরনাথের এ ডাক শুক্লার কানেই পৌঁছয় না।

শুক্লার মনের কল্পনা যথার্থই রূপ পেয়েছে তার নিজ হাতে গড়া মূর্তিতে। সেদিন সাধুচরণকে সে যেমনটি দেখেছিল ঠিক তেমনি অসহায়তার ভাবই ফুটে উঠেছে এ মূর্তির চোখে মুখে। তার শিল্পসাধনা সার্থক।

কিন্তু সাধুচরণের কী অপরাধ, কেন তার এতো অসহায়তা? এ অবস্থা তো তারও হতে পারতো, হতে পারতো তপতীবাবুর স্ত্রীরও! দুঃখী মানুষের প্রতি তবু মানুষের এমনি অবজ্ঞা কেন?—সাধুচরণের মাটির মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে শুক্লা এমনি সব কথাই একান্ত নিরালায় একমনে ভেবে চলেছিল।

শহরের কোন হল্লা, কোন হট্টগোলই তার মনকে টলাতে পারছিল না।

ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ, ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ।—হঠাৎ তপতীবাবুদের দোতালার বারান্দা থেকে শেকল-বাঁধা শিকারী গ্রে হাউণ্ড কুকুরটা তার অবিরাম কর্কশ চিৎকারে সারা পাড়াটাকেই যেন মুখর করে তোলে। কিন্তু তাতেও নিশ্চল নিস্পন্দ শুক্লা।

শুক্লা, শুক্লা, শুক্লা!—অমরনাথ আর সহ্য করতে পারে না নীরবতা, তার ডাকের নিরুত্তরতা। অসহনীয় আবেগে সে তাই ছুটে গিয়ে শুক্লার তুহাত ধরে এমনি ঝাঁকুনি দেয় তাকে যে, চমকে উঠেও সে কোন উত্তর খুঁজে পায় না সহসা। অমরনাথের দিকে শুক্লা চেয়েই থাকে অবাক বিস্ময়ে কয়েক মূহূর্ত ধরে।

তপতীবাবুদের কুকুরটা তখনও ডেকেই চলেছে। এতোক্ষণে শুক্লা শুনতে পায় সে ডাক।

কে, তুমি হঠাৎ?—সবিস্ময়ে জিগ্যেস করে শুক্লা।

তোমার কি হয়েছে, তাই পরিষ্কারভাবে জানতে এসেছি। আর কিছু নয়।—উত্তর দেয় অমরনাথ।

কিছুই হয় নি। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, অবিশ্বাস আর হৃদয়হীনতার কথাই একা একা বসে ভাবছিলাম। ঐ শুনলে না ও বাড়ির গ্রে হাউণ্ডটার বীভৎস চিৎকার, কী নারকীয় হুমকী! তপতীবাবুদের বিপুল সম্পত্তির ওপর কারুর লোভদৃষ্টি পড়লে আর উপায় নেই, তাকে দাঁতে-নখে একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে। এমন কি ওদের কাছে কোন করুণা ভিক্ষে করাও চলবে না। বলতে পারো কেন এমন হয়?

না, ওসব ভাববাব সময় নেই আমার।

সে কী, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দুর্গত লাঞ্ছিত মানুষের কথা ভাববার সময় নেই তোমার? তুমি ভাববে না তাদের কথা, তাদের দুর্দশার প্রতিকারের কথা?

কেন ভাববো, তাদের দুর্গতির দায়িত্ব তো আমার নয়, শুক্লা!

আলবৎ তোমার। তোমার-আমার এবং আমাদের মতো আর সকলের। তা না হলে আমারই দেশের মানুষের অবস্থা এ রকম হতে পারে কখনও? মনুষ্যত্বের মহিমা থেকে কে বঞ্চিত করেছে একে, এর মতো হাজার হাজার দেশবাসীকে? —মাটির মূর্তি দেখিয়ে সুকঠোর প্রশ্ন করে শুক্লা।

অমরনাথের মাথার মধ্যে যেন দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে এই জিজ্ঞাসায়। একটা অধীর উন্মত্ততায় ছুটে গিয়ে সে এক ধাক্কায় ফেলে দেয় মাটির মূর্তিটাকে।

তুমি কি এদের কথাই বলবে শুক্লা! আমার জন্যে কি একটুও স্থান নেই তোমার মনে? তবে কি সব মিথ্যে?—উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে অধিকতর উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে অমরনাথ।

এ কি করলে অমরনাথদা! সাধুচরণের মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তুমি যে আমার কল্পিত তোমার স্বপ্নময় মূর্তিকেও চুরমার করে ফেললে! আপন সিংহাসনকে তুমি নিজ হাতে নিশ্চিহ্ন করে নিলে আমার মন থেকে! একজন দরদী মানুষ হিসেবেই তোমাকে আমার মনের কাছে নিবিড় করে পেতে চেয়েছিলাম অমরনাথদা! কিন্তু…।—ঘরময় ছড়ানো মাটির পুতুলের ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে চেয়ে বলে চলেছিল শুক্লা। কিন্তু অমরনাথ আর স্থির থাকতে পারে না সেখানে। ছিটকে বেরিয়ে যায় স্টুডিও ঘর থেকে।

'আনন্দ নিকেতন' থেকেও কখন যে অমরনাথ চলে যায় তা কেউ টেরও পায় না।

হঠাৎ তপতীবাবুর স্ত্রীর ছবিটা ভেসে ওঠে শুক্লার চোখের সামনে।

সাধুচরণের মুখের ওপর কীভাবে সে সজোরে দোর বন্ধ করে দিলে! পক্ষাঘাতগ্রস্ত সমাজদেহে এক একটি দুষ্ট ক্ষত এরা, এক একটি কলংক চিহ্ন। সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া কী করে আর রক্ষা পাওয়া যাবে এ পচন থেকে!

শুক্লার শিল্পী মন বিষিয়ে ওঠে ভেবে ভেবে। সে রাত্রিতে আর খাওয়া দাওয়া হয় না তার, ঘুমও নয়।

সকাল বেলা উঠেই শুক্লা তার শোবার ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। সাজানো টবের ফুলগুলোর দিকে চেয়ে তার মনের গ্লানি কেটে যায় অনেকখানি। প্রফুল্লতা ফিরে আসতে থাকে ধীরে ধীরে।

কিন্তু একি, অমন সুন্দর ডালিয়া ফুলটির পাপড়িগুলোকে এমনি করে কেটে ফেলেছে পোকায়?

কাছে গিয়ে শুক্লা আদর করে ফুলটিকে। কিন্তু সারা টবটাই যে পোকায় ভর্তি!

টবটা আর না পাল্টালেই নয়!

ডাকটিকিট

অন্ধকারে যেন দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে উপানন্দর চোখ দুটো।

কল্যাণী নিজের মুখে বলেছে একথা!—বিস্ময় প্রকাশ করেন উপানন্দ।

তা বল্লেই বা দোষের কী? বয়েসের মেয়ে। তার একটা সাধ ইচ্ছে হতে নেই বুঝি!—মৃন্ময়ী উত্তর দেয়।

না, সে কথা বলছি না। কল্যাণীকেই বা দোষ দিচ্ছি কোথায়, নিজেই বরং নিজের দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি।

তা না করে উপায়ই বা কী! ঘরে সোমত্ত মেয়ে রেখে তুমি দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াবে। তারপর কোন একটা অঘটন ঘটে গেলে তার দায়িত্ব এসে পড়বে সব আমার ঘাড়ে, সেটি হবে না। এ আমি আগে থেকেই বলে রাখছি।—মেয়ের বিয়ের সমস্যা নিয়ে রাত্রির নিরালায় সামান্য একটু কথা কাটাকাটি হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

একটা বড়ো সওদাগরী অফিসের রিটায়ার্ড বড়োবাবু উপানন্দ বাগচী। অবসর নেবার সময় বেশ কিছু টাকা তিনি পেয়েছিলেন প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে। ত্রিশ বছর কাজের হিসেবে পনেরো মাসের মাইনেও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল গ্র্যাচুইটি বাবদ। সমস্ত দায় দায়িত্ব পালন করে মোটামুটি-ভাবে সুখে শান্তিতে বাকি জীবনটা এই টাকায় কাটিয়ে যাওয়া খুব কঠিন হতো না। কিন্তু সওদাগরী অফিসের এতোদিনের অভিজ্ঞতাই শেষ পর্যন্ত বিপদ বাধালো।

অর্থ খাটালেই অর্থ। বড়ো একটা বৃটিশ ফার্মে বাগচী মশাই শুধু এই দেখেছেন ত্রিশ বছর ধরে। অর্থ খাটাতে যেয়ে যে কতো অনর্থ ঘটতে পারে সে ধারণা তাঁর কোনদিন হতো না যদি না মাড়োয়ারী বন্ধুর সঙ্গে তিনি তাঁর প্রায় সমুদয় টাকা নিয়ে ব্যবসায়ে নামতেন।

যাক্‌গে, জেলহাজত যে ঘুরে আসতে হয় নি তাই যথেষ্ট।

যে লাইনের ব্যবসায়ে তাঁকে নিয়ে চলেছিলেন তাঁর পার্টনার তাতে যে কোন সময়ই হাতকড়া পড়তে পারতো। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তা থেকে যে তিনি নিষ্কৃতি পেয়েছেন সে জন্যে তাঁর অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেন বাগচী।

তা হলেও সন্তান শোকের চেয়ে বড়ো কম নয় টাকার শোক। সে শোক ভুলে থাকার জন্যে উপানন্দর সে কী কম চেষ্টা!

হারানো টাকার প্রসংগটা যাতে কখনো কোন ব্যাপারে না ওঠে সেদিকে মৃন্ময়ীরও সতর্ক দৃষ্টি। ব্যবসায়ে এতো বড়ো একটা মার খাবার পর বাড়িতে একটা সহজ আবহাওয়া না রাখলে কখন কী হয়ে যাবে কে বলতে পারে?

মৃন্ময়ী তাই স্বামীর মতেই মত দিয়ে আসছেন এদ্দিন ধরে। উপানন্দ এই যে অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে এলেন শান্তি সম্মেলন উপলক্ষ করে এও সম্ভব হয়েছে মৃন্ময়ীরই জন্যে।

ডাকটিকিট সংগ্রহের একটা সখ ছিল উপানন্দর ছোটবেলা থেকেই।

সওদাগরী অফিসে চাকরি করার সময় অনেক টিকিটই বাগচী সংগ্রহ করেছেন। বিলিতি ফার্ম। দেশবিদেশ থেকে

নানা দামের নানা রকমের ডাকটিকিট মারা চিঠি এসেছে বড়োবাবুর দপ্তরে। বড়োবাবু নিজ হাতেই খুলতেন সে সব চিঠি আর খাম থেকে অতি যত্নে কেটে কেটে রাখতেন যতো রকমের ডাক টিকিট। তখনো পর্যন্ত একে সখই বলা যেতো। ইংরেজিতে যাকে বলে 'হবি'। কিন্তু হাজার পনেরো বিশ টাকা ব্যবসায়ে ওড়াবার পর এই টিকিট সংগ্রহের ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তাকে আর 'হবি' বলা চলে না। সেই থেকে এ একটা রীতিমতো বাতিক।

যাক্ একটা কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে ভদ্রলোককে! মৃন্ময়ী তাই চুপ করেই থাকেন, এ নিয়ে কখনো তেমন আর কিছু বলেন না।

কিন্তু সব হারিয়েও সখের মাত্রা যদি অত্যধিক বেড়ে ওঠে আর সেই সখ বজায় রাখতে যদি ঘর থেকে টাকা বার করতে হয় তখন নিতান্ত শান্ত গৃহিণীরও মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে বৈকি!

এই ডাকটিকিট কেনার ব্যাপার নিয়েই একদিন হঠাৎ মৃন্ময়ীর মেজাজ এমনি বিগড়ে গেল যার জন্যে পরে তাঁকে আফশোষ করতে হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। শুধু কি তাই, নিজের গয়না বিক্রি করে স্বামীর দেশ পর্যটনের টাকা যুগিয়ে দিয়ে তবে তাঁর শান্তি।

স্বামী নিগ্রহের প্রায়শ্চিত্ত আর কি!

চাকরি থেকে অবসর নিয়ে টুকটাক কখন কোথা থেকে ডাকটিকিট সংগ্রহ করতেন বা কিনে আনতেন উপানন্দ তার বড়ো একটা খোঁজখবর রাখতেন না মৃন্ময়ী। তবে সেদিনের এতো বড়ো ব্যাপারটা আর চোখে না পড়ে যায় কখনো?

হঠাৎ আবার কোন্ অমূল্য সম্পদ নিয়ে এলে বস্তা

ভর্তি করে?—উপানন্দর কথামতো পুরানো কাগজওয়ালা বারান্দার এককোণে বস্তাটা নামিয়ে রাখতেই গিন্নী ছুটে এসে প্রশ্ন করেন। মেজাজটা আগে থেকেই তিরিক্ষি হয়েছিল মেয়ের বিয়ের চিন্তায়।

এ তুমি চট করে বুঝবে না গিন্নী। পরে তোমায় সব বুঝিয়ে বলবো। এখন চাবিটা দাও দেখি একবার।—কর্তা শান্তভাবেই জবাব দেন।

চাবি আবার কেন?

বাঃ, এর দামটা মিটিয়ে দিতে হবে না বুঝি!

কতো?—বিরক্তির ঝাঁজ মেশানো প্রশ্ন।

এগারো টাকা।

এগারো টাকা! তুমি কতো টাকা আমায় এনে দাও, শুনি। আর কতো টাকাই বা তুমি আমার কাছে জমা রেখেছো, বলো দেখি।—মৃন্ময়ী একটু উত্তেজিতভাবেই জিগ্যেস করেন।

উপানন্দর মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে যায় মৃন্ময়ীর কথায়। সত্যি কথাই তো, তিনি তো কিছুই আর এনে দেন না স্ত্রীর হাতে। একমাত্র দোতলার একশ' টাকা বাড়ি-ভাড়াটাই সম্বল। তা দিয়ে ছেলেমেয়ে দুজনের কলেজের খরচ চালিয়ে চারজনের সংসার চালানো, সে যে কী করে সম্ভব হচ্ছে তাইতো বুঝে ওঠা দুষ্কর। কিন্তু তা হলেও লোকটাকে টাকা তো দিতেই হবে। ভাড়ার টাকাটা হয়তো এখনো নিঃশেষ হয়নি একেবারে। সেই ভরসাতেই আর একবার সবিনয় প্রার্থনা জানান উপানন্দ।

দেখোনা একবার গিন্নী, ভাড়ার টাকা থেকে এখনো কিছু আছে কিনা। দর করে জিনিষগুলো নিয়ে এলাম, আবার ফিরিয়ে দেবো লোকটাকে?

তুমি নিজেই গিয়ে দেখো কী আছে না আছে। আমায় আর জ্বালিও না।—এই বলে শাড়ির আঁচল থেকে চাবির তোড়াটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেন মৃন্ময়ী। তারপর ছুটে গিয়ে সেই যে রান্নাঘরে ঢোকেন আর কোন কথার মধ্যেই আসেন না।

উপানন্দ কোন রকমে তুলে নেন চাবির তোড়াটা। ঘরে যেয়ে গৃহিণীর ক্যাশবাক্সটি খুলে ক্যাশের অবস্থা যা দেখেন তাতে মুষড়ে পড়তে হয় তাঁকে।

মাত্র ন'টি টাকা আর কিছু খুচরো রয়েছে বাক্সে। কী হবে এখন? বিষম ভাবনায় পড়ে যান উপানন্দ।

এদিকে কাগজওয়ালা ভাবছে, এ তো বেশ ভালো ঝঞ্ঝাটেই পড়া গেলো দেখছি!

কয়েকটা টাকা বেশি দর পেয়ে বেচারা রাজি হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কতোগুলো ফালতু কথা-কাটাকাটি শুনে আর সময় নষ্ট করে হয়তো তাকে ফিরেই যেতে হবে।

বাবুজী!—অধীর হয়ে উঠে উপানন্দকে ডাকে কাগজওয়ালা।

সত্যি কথাই তো, সে বেচারা আর কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে!

উপানন্দ চমকে ওঠেন সে ডাক শুনে। যতি পড়ে তাঁর ভাবনায়। ঐ ন'টা টাকা তুলে নিয়েই তিনি বেরিয়ে আসেন বাইরে।

পুরো দামটা কিন্তু ভাই দিতে পারছি না তোমার!—ন'টা টাকা হাতে দিয়ে কেমন একটু কাঁচুমাচু হয়েই যেন উপানন্দ বলেন কাগজওয়ালাকে। পাছে জিনিষটা হাতছাড়া হয়ে যায় এই ভয়।

ঠিক আছে বাবুজী! আর এক দফে পুষিয়ে দেবেন।—একটি একটি করে গুণে ন'খানা একটাকার নোট একত্রে

ভাঁজ করে ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে বেশ যেন একটু মুরুব্বিয়ানার সুরেই জবাব দেয় কাগজওয়ালা।

এমনি ক্ষেত্রে মুরুব্বিয়ানার ভাব একটু আসারই কথা। মনে মনে সে বেশ ভালো করেই হিসেব করে দেখছে যে, নীট অন্তত ছুটো টাকা যে লাভ হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। পুরানো কাগজের দোকানে সে বড়ো জোর সাত টাকা পেতো, তার বেশি কিছুতেই নয়। এ অবস্থায় ন'টা টাকা পেয়ে খুশি হয়ে সে না হয় উপানন্দ বাগচীকে বাকি ছুটো টাকা ছেড়েই দিল। তার মহত্বই প্রকাশ পাবে। আর তাই বুঝে সে যদি সে সুযোগই নিয়ে থাকে তাহলে তাকে অস্বাভাবিকও বলা চলে না।

সেলাম ঠুকে বিদায় নেয় কাগজওয়ালা। আর যাবার সময় সে মনে মনে ভাবে, এমন বেয়াকুব মানুষ তো সে জীবনে দেখে নি কখনো। খদ্দের যে বিক্রেতাকে যেচে বেশি দেয়, এ বোধহয় বেচাকেনার ইতিহাসে এই প্রথম।

উপানন্দর ভাবনা কিন্তু অন্য রকমের।

কাগজওয়ালাকে বিদায় দিয়ে বারান্দায় পুরানো ইজি চেয়ারটায় ধপাস করে বসে পড়েন উপানন্দ। আর সেই থেকে সেখানে বসে একমনে শুধুই ভাবছেন। মাথায় হাত দিয়ে গভীর ভাবে ভাবছেন, সোহনলালের কথায় অতোগুলো টাকাকে যদি তিনি তচনচ করে না ফেলতেন তাহলে আজ কি তাঁকে এমনি অপমান সইতে হতো মৃন্ময়ীর কাছে? ত্রিশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও অদৃষ্টে শান্তি নেই তাঁর! ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে পড়েন উপানন্দ।

কী, এমনি করে শুয়ে থাকলেই চলবে নাকি? মুঠো ভরে তো ঘরের টাকা ক'টা দিয়ে দিলে কী সব ছাইপাঁশ

কিনে এনে। কাল থেকে নুন-ভাত আসবে কোত্থেকে, সে কথা ভেবেছ কিছু ?—মৃন্ময়ী রান্নার কাজ শেষ করে এসে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে জিগ্যেস করেন উপানন্দকে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা ? অজ্ঞানের মতো হয়ে পড়েছেন উপানন্দ। শীতের দিনেও কেমন ঘাম দিয়েছে সারা শরীরে! তাঁর দিকে চোখ পড়তেই চিৎকার করে ওঠেন মৃন্ময়ী।

কল্যাণী! ও কল্যাণী!

মা!—মায়ের আতংকিত কণ্ঠের ডাক শুনে হাতের নভেলটাকে টেবিলে ফেলে রেখে ছুটে আসে কল্যাণী। বাবার চোখে মুখে মাকে জল ছিটোতে দেখে এক দৌড়ে পাখাখানা নিয়ে এসে মাথায় বাতাস করতে আরম্ভ করে। ডাক-চিৎকারে ওপরতলার ভাড়াটেরাও নেমে আসেন ছুটোছুটি করে। আশপাশের লোকজনেরাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য জ্ঞান ফিরে আসে উপানন্দর। ডাক্তার আর ডাকতে হয় না, উদ্যোগেই কাজ হাঁসিল।

সংসারের জন্যে অত্যধিক দুশ্চিন্তাই যে বাগচী মশাইর এরূপ অস্থির হয়ে পড়ার কারণ, পাঁচজনের আলোচনায় এটা যথারীতি স্থির হয়ে যায়। তবে ওপরতলার বুড়িমা বলেন, এ অবস্থায় একটু মকরধ্বজ পড়লে ফলটা ভালো হবে। তাই তিনি নিজেই উদ্যোগ করে সে ব্যবস্থাটা নিজ হাতেই করে দেন।

আসলে রোগটা উপানন্দর হাই ব্লাড প্রেসার। কয়েকদিন আগে হঠাৎ একবার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল তাঁর। পঞ্চানন ডাক্তারের চেম্বারে বসে বসে গল্প করতে করতেই ঘটনাটা ঘটে। পরীক্ষাটাও তাই সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যায়। প্রেসার নেবার পরেই ডাক্তারের কপালের রেখাগুলো এমন স্পষ্ট

হয়ে ওঠে যে, উপানন্দ ভড়কে যান তা দেখে। তবে ডাক্তার তাঁকে অভয় দিয়েই বলেছিলেন, 'দাদা, একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। আর খাওয়া দাওয়া একেবারে কণ্ট্রোল! আমি একটা ওষুধও দিয়ে দেবো। ভয় নেই কিছু।'

ডাক্তার ওষুধ দেন নি, দিয়েছিলেন প্রেসক্রপশন। কাজেই ওষুধ আর আসে নি। আর ভোজন ব্যাপারে কীইবা আর কণ্ট্রোল করার আছে? তাই বাড়িতে এ ব্যাপারটা একদম চেপেই গিয়েছিলেন উপানন্দ।

পঞ্চানন ডাক্তার অবশ্য পরে আরো দু একবার তুলে-ছিলেন কথাটা। কিন্তু উপানন্দ তেমন আমোল দেন নি বলে তিনিও আর মাথা ঘামান নি। তবে বলে দিয়েছিলেন উপানন্দকে যে, সাতান্ন বছর বয়সে ২৩০ সিস্টোলিক আর ১১০ ডায়স্টলিক চাপ উপেক্ষা করার ব্যাপার নয়, সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

তারই ফলে ঘটে এই দ্বিতীয় বারের ঘটনা।

একটু সতর্ক থাকলে কখনো এমনি হতো না, পঞ্চানন ডাক্তার জোর গলায়ই বলেন সে কথা। বিকেলের দিকে খবর পেয়েই ডাক্তার ছুটে এসেছিলেন উপানন্দকে দেখতে। সেই প্রথম তাঁর কাছ থেকে বাড়ির লোকেরা জানতে পারে, কর্তার হাই ব্লাড প্রেসার।

হবে না, সারাদিন ডাকটিকিট, ডাকটিকিট করে যে রকম দুর্ভাবনা ভদ্রলোকের!—চলে যাবার সময় এ মন্তব্যই করেছিলেন পঞ্চানন ডাক্তার।

সেই থেকে মৃন্ময়ী আর কিছুই বলেন না কর্তাকে।

নেই নেই করেও যা কিছু আছে, সংসারে যা কিছু হয়েছে—এই ঘরবাড়ি গহনা-পত্র সবই তো এই একটি লোকেরই পরিশ্রমের ফল। সোজা মানুষ। বন্ধুবান্ধবদের বিশ্বাস করে

কতোগুলো টাকা হয়তো নষ্ট করছেন। তা' সেও তো তাঁরই টাকা। টাকাগুলো থাকলে সংসারের অবশ্য আর কোন ভাবনাই থাকতো না। কিন্তু হারানো টাকার জন্যে ওঁর শোকটাই তো বেশি সবার চেয়ে!

কাজেই সেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দেওয়াই ভালো। মৃন্ময়ী এসব সাতপাঁচ চিন্তা করেই উপানন্দর সব কথা সব কাজেই সায় দিয়ে আসছেন সেই থেকে।

টাকা, টাকা আর টাকা!

এই টাকার জন্যেই যতো অশান্তি। কি পারিবারিক, কি জাগতিক সমস্ত অশান্তির মূলেই এই টাকা।

পৃথিবী থেকে যুদ্ধ বিগ্রহের উত্তেজনা ও অশান্তি দূর করতে হলে মানুষের মন থেকে এই অর্থলোভকে প্রথম দূর করা দরকার।

কিন্তু সে কী বড়ো সহজ ব্যাপার! সহজ না হলেও এ চেষ্টা করতেই হবে।

তাইতো উপানন্দ কিছুকাল থেকে শান্তি আন্দোলনের মস্ত বড়ো একজন সমর্থক হয়ে উঠেছেন। সভায় সভায় শুধু শ্রোতা হিসেবে নয়, বক্তা হিসেবেও জায়গায় জায়গায় এখন দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে।

একদিন হঠাৎ রটে গেল, পশ্চিম বাঙলা থেকে এবার বিশ্বশান্তি সম্মেলনে ফিনল্যাণ্ডের হেলসিংকিতে যাঁরা প্রতিনিধি যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে উপানন্দ বাগচী মশাইও একজন।

সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না এ রটনা। কোথায় টাকা পাবেন তিনি? তা ছাড়া সংসারে একা পুরুষ মানুষ। কার ওপর ভার দিয়ে যাবেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যার?

গুজবে কান দেওয়া ঠিক নয়, গুজবের কথা উড়িয়ে

দেওয়াই ভালো—সবই ঠিক কথা। কিন্তু যা রটে, তার কিছুটা বটে, এ প্রবাদও একেবারে অমূলক নয়।

গিন্নী জানো, আজ যদি হাজার দুই টাকাও আমার হাতে থাকতো তাহলে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ পরপর ঘুরে আসতে পারতাম।

সত্যি?—গিন্নী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন।

বিশ পঁচিশ হাজার টাকায় যা সম্ভব হয় না, দুহাজার টাকাতেই আমার তা হয়ে যেতো! কিন্তু লোভী বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সবই খুইয়ে বসেছি, তা আর হবে কী করে?—একদিন চুপি চুপি মৃন্ময়ীর সঙ্গে এমনি কথাবার্তা চলে উপানন্দর।

স্বামীর কথায় গভীর দুঃখ পান মৃন্ময়ী। কিন্তু তিনি কী উত্তরই বা দিতে পারেন চট্ করে! খানিকক্ষণ বাদে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কথাটুকু বেরিয়ে আসে তাঁর মুখ থেকে তাতে আশ্বাসের সুর আছে বটে, কিন্তু আসন্ন সুযোগ গ্রহণের কোন সম্ভাবনাই খুঁজে পাওয়া যায় না।

তা ভগবান দিন দিলে আবার তোমার সুযোগ আসবে। ছেলে বড়ো হচ্চে, লেখাপড়া শিখছে, দু'তিন বছর বাদে চাকরি বাকরি করবে। বাপকে দিতে পারবে না দুহাজার টাকা?—মৃন্ময়ীর আশার কথায় একটু শুধু হাসেন উপানন্দ।

এ হাসি যে ব্যথার হাসি, নৈরাশ্যের বিদ্রূপের প্রতি উপেক্ষার প্রকাশ, তা বুঝতে বাকি থাকে না মৃন্ময়ীর। এর ফলে আবার কী দাঁড়াবে কে জানে? গভীরতর চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন বাগচী-গৃহিণী।

ওগো শুনছো, আজ শুনে এলাম হাজার টাকার মতো হলেই বেশ একটা লম্বা টুর দিয়ে আসা চলে। বাকি

টাকাটা শান্তি সম্মেলনের তরফ থেকেই চালিয়ে নেওয়া হবে।—কয়েকদিন বাদে আবার এক সময় মৃন্ময়ীকে ডেকে বলেন উপানন্দ।

বেশতো, এতোই যখন ইচ্ছে ঘুরেই এসো না।

কোথায় পাব টাকা? যতো সামান্যই হোক না কেন আজ আর আমায় কে ধার দেবে?

তা না হয় আমিই দেবো। তবু তুমি সখ মিটিয়ে একবার ঘুরে এসো। শরীরটাও ভালো হবে তাতে।

সখ তো শুধু এক রকমের নয় গিন্নী, দুরকমের। এ সম্মেলনে যেতে পারলে একই সঙ্গে সেই দুরকমের সখই মিটবে।

সে আবার কী রকম?—গিন্নীর মনে কেমন একটা সন্দেহের কামড় লাগে। এই বুড়ো বয়সে আবার মেম সাহেবদের দিকে মন ঝুঁকলো নাকি! বেটাছেলেদের ব্যাপার কিছুই তো বলা যায় না, ঠিক এমনি ভাবখানা।

কেন, দেশ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ডাক টিকিট সংগ্রহের কাজটাও অনেকদূর এগোবে। কিন্তু তুমি টাকা পাবে কোত্থেকে, আমি সে কথাই ভাবছি।—দুশ্চিন্তার কথাটা প্রকাশ করে ফেলেন উপানন্দ।

ও এই!—গিন্নী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

সে নিয়ে আর ভাবাভাবির দরকার নেই। আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। হাতে শুধু দুগাছ করে চুড়ি রেখে আমার সব গয়না বিক্রি করে দিয়েও আমি তোমায় টাকার জোগাড় করে দেবো।—মৃন্ময়ীর এ কথায় আনন্দে আর স্থির থাকতে পারেন না উপানন্দ। কিন্তু তবু তাঁর বিস্ময় কাটতে চায় না সহজে। একালেও এমন পতিভক্তি? দেখেশুনে একটু তাজ্জব বনে যেতে হয় বৈ কি!

শেষ পর্যন্ত তাই হয়। স্ত্রীর গহনা বিক্রির টাকা

নিয়েই শান্তি-পথিক হন উপানন্দ। যাত্রার আগে স্ত্রীকে বলেন, অনেক কাল আগে এক জ্যোতিষী বলেছিলেন, আমার হাতে নাকি বিদেশযাত্রার যোগ আছে। আমি তাঁর কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেম। এখন দেখছি, তাই ঠিক হয়ে গেল!

ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামত বাড়ে। তা ঠিক হয়ে গেল কার জন্যে শুনি, জ্যোতিষী বলেছিলেন বলে না আমি টাকা যোগাড় করে দিলুম বলে।—কর্তাকে সগৌরবে প্রশ্ন করেন মৃন্ময়ী।

আরে দূর কোথাকার কে জ্যোতিষী! তাঁর কথায় কী আসে যায়? তোমার মতো স্ত্রী না থাকলে কী দেশভ্রমণ ভাগ্যে ঘটে কখনো? তবে সুযোগটা দিয়েছেন শান্তি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা, এটা তোমায় মানতেই হবে।—পরিহাস প্রসংগে আসল কথাটাও স্ত্রীকে জানিয়ে দিতে ভুল করেন না উপানন্দ।

যাবার সময় বাগচী মশাই একথাটাও জানিয়ে যান যে, সম্ভব হলে অর্থাৎ অর্থে আর স্বাস্থ্যে কুলোলে তিনি একেবারে ওয়ারশর যুব উৎসবটাও দেখে আসবেন এবং ঐ দলের সঙ্গেই দেশে ফিরবেন। দেড় মাসের ওপরে আর দু'মাস, এইতো! তাঁর আর কীইবা এমন তাড়া আছে?

তাড়া আর তেমন নেই কিছু। তবে মেয়েটা তো রয়েছে ঘাড়ের ওপর!—এই চিন্তার কথাটা একবার স্মরণ করিয়ে দেন মৃন্ময়ী।

একেবারে ভোলানাথ হলে চলবে কেন সংসারী মানুষের। দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট সংগ্রহের ঝোঁকে আবার না পেয়ে বসে। মৃন্ময়ীর এও এক বিষম ভয়।

না, না ও সবের কিছু ভয় নেই বৌদি। আমরা যখন

সঙ্গে যাচ্ছি, দাদাকে ঠিক ফিরিয়ে এনে দেবো।—অভয় দেন উপানন্দর একজন সংগী।

কিন্তু সত্যি সত্যি শান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফিরে আসেন না উপানন্দ। বাড়িতে মহা দুশ্চিন্তা তা নিয়ে। হেলসিংকিতে শান্তি সম্মেলন শেষ করে চেকোশ্লোভাকিয়া হয়ে রাশিয়া সফরের পর মস্কোতেই তিনি রয়ে গেলেন। ওয়ারশতে যুব উৎসব দেখে তিনি দেশে ফিরবেন।

শান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধিরা কেউ কেউ এসে মাঝে মাঝে প্রবোধ দিয়ে যান মৃন্ময়ীকে। ইতিমধ্যে চিঠিও আসে ওয়ারশ থেকে।

পৃথিবীর বিরাটতম উৎসব বসেছে পোল্যাণ্ডের রাজধানীতে। একুশ দিন ব্যাপী এই উৎসব শেষ করে উপানন্দ আর সব ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে মস্কো ফিরে আসবেন। তারপরে পিকিং হয়ে একেবারে দেশে।

নির্ধারিত কর্মসূচীর ব্যতিক্রম হয় না এবার। নির্দিষ্ট দিনেই উপানন্দ সদলবলে কোলকাতায় ফিরে আসেন।

তারপর থেকে শুধু গল্প আর গল্প। শান্তি সম্মেলনের গল্প, যুব উৎসবের গল্প আর নানা দেশের নানা রকমের গল্প। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার গল্প ফুরোতে চায় না উপানন্দর।

ইবনবাতুতাকেও হার মানালেন দেখছি উপানন্দবাবু!—প্রতিবেশী এক ইতিহাসের অধ্যাপক একদিন মন্তব্য করেন বাগচী মশাইর গল্প শুনে।

ইবনবাতুতার গল্পটি কি বলুন তো শুনি।—তিনি যাঁকে হার মানালেন তাঁর কথা না শুনে মনে শান্তি হতে পারে কখনো। উপানন্দ তাই শুনতে চান তাঁর কাহিনী।

না বাগচী মশাই, আপনার সঙ্গে ইবনবাতুতার কোন দিক থেকেই কোন রকম তুলনা হতে পারে না। তিনি দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন যৌবনে, মাত্র একুশ বছর বয়সে। সে ছ'শ' বছরেরও আগের কথা। জলপথে আর স্থলপথে দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে ক্রমাগত ঘুরেছিলেন তিনি। তাঞ্জিয়ারের এই তরুণ পর্যটক সাতাত্তোর হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে যখন দিল্লীতে এসে পৌঁছলেন তখন দিল্লীর সম্রাট সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক। সম্রাট তাঁকে সম্মানিত করলেন প্রধান বিচারপতির পদে অভিষিক্ত করে। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে আপনি চার মাসের মধ্যে যেভাবে পৃথিবীর অর্ধেক পর্যটন করে এলেন তার জন্যে কী পুরস্কার আপনি আশা করতে পারেন আমাদের দেশের স্বাধীন সরকারের কাছ থেকে?

কোন পুরস্কারের প্রত্যাশী তো নই আমি, প্রফেসর রায়। যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমি লাভ করে এসেছি পশ্চিমের নানা দেশ থেকে তার কথাই সকলকে বলে যাব। পৃথিবীর সব সাধারণ মানুষই শান্তি চায়, হিংসা-দ্বেষ থেকে মুক্তি চায়। তার জন্যে যে সব ব্যবস্থার প্রয়োজন তারই তো মহড়া চল্‌ছে আজ দিকে দিকে। কী আর বলবো প্রফেসর রায়, মানুষের দুঃখের দিনের অবসান হয়ে আসছে, এ বিশ্বাস আমার যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে।—এই বলে উপানন্দ যেন একটা বক্তৃতা আরম্ভ করে দেন রীতিমতো।

কিন্তু অধ্যাপক মশাই বিদায় নেন তাঁর কলেজের সময় হয়ে গিয়েছে বলে।

তবে শিকারের বড়ো একটা অভাব হয় না।

পঞ্চানন ডাক্তারকে পথে পেয়েই মস্কো-পিকিং ট্রেন জার্নির অপূর্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা আরম্ভ করে দেন উপানন্দ।

ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলপথে এগারো দিনের এই দীর্ঘতম ট্রেন জার্নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে কাউকে ভুগতে হয় নি, আর এখানে রাণাঘাট থেকে কোলকাতা আসতে কী হয়রানি! আমাদের দেশে কবে যে এসব পাওয়া যাবে, উপানন্দ তাই ভাবেন এবং প্রশ্নও করে বসেন পঞ্চানন ডাক্তারকে।

কিন্তু রোগী দেখার তাড়ায় ডাক্তারও চলে যান।

সবাই কাজে কর্মে ব্যস্ত। কাজেই উপানন্দর অনেক গল্পই আর বলা হয় না। সেজন্যে উপানন্দর মনে কি কম দুঃখ!

কিন্তু মৃন্ময়ী তার কী প্রতিকার করতে পারেন?

স্বামীর গল্প অবশ্য তিনি বসে বসে শুনতে পারেন। কিন্তু শুধু গল্প করলে আর গল্প শুনলেই তো চলবে না। মেয়েটা যে ঘাড়ের উপর একেবারে পাহাড়-চাপা হয়ে আছে।

সে কথাটাই সেদিন রাত্রিতে মৃন্ময়ী কথায় কথায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন স্বামীকে। দেশ-বিদেশের ডাকটিকিটের গল্প বলায় বাধা পড়েছিল তাতে।

•

কল্যাণীর বিয়ের জন্যে তার বাপ-মাকে মোটেই ভাবতে হবে না, একথা যে কল্যাণী নিজের মুখে বলতে পারে তা বিশ্বাসই করতে চান না উপানন্দ।

এ নিশ্চয়ই অভিমানের কথা। সত্যি সত্যি মেয়ের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কোন চেষ্টাই তো এ পর্যন্ত করা হয় নি। এক এক করে ওর কলেজের বন্ধুদের সবারই তো প্রায় বিয়ে-থা হয়ে গেল। কল্যাণীর মনে অভিমান হওয়া তো অন্যায় কিছু নয়। নিজেকেই মনে মনে দোষী সাব্যস্ত করেন উপানন্দ।

মৃন্ময়ী আস্তে আস্তে সঞ্জয় মুখার্জির কথা তোলেন। এই ছেলেটিকেই পছন্দ কল্যাণীর। ছেলেটিরও পছন্দ কল্যাণীকে।

বেশ তো, ক্ষতি কি? লেখাপড়া, রুজি রোজগারে যদি ছেলেটি ভালো হয়ে থাকে তাহলে আর আপত্তি করার কী আছে?—উপানন্দ উত্তর দেন।

আমাদের দিক থেকে আবার আপত্তির কী থাকতে পারে, আপত্তি এসেছে ছেলের বাপের দিক থেকে। তাঁর যে অনেক দাবী। তাছাড়া আমাদের অবস্থার কথা কার বা না জানা। এমন গরীব ঘরের মেয়েকে কোন্ বাপ-মাই বা সাধ করে ছেলের বৌ করে নিতে চায়?—মৃন্ময়ী আসল সমস্যাটা তুলে ধরেন স্বামীর সামনে।

ও এই কথা! তা কল্যাণীর কপালে থাকলে ওর সুখশান্তির পথে আমাদের অভাব অনটন বাধা হবে না কখনো।—কেমন যেন অদৃষ্টবাদীর সুর বেজে ওঠে উপানন্দর কথায়।

মৃন্ময়ীর কাছে সব কথা শুনে কল্যাণীর বিয়ের সমস্যাই তোলপাড় সুরু করে উপানন্দর মনে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায়, ডাকটিকিট অক্‌শনের একটা বিজ্ঞাপন তিনি দেখে গিয়েছিলেন শান্তি সম্মেলনে হেলসিংকি যাবার আগে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে আর কথা নেই। একটা খবরের কাগজের আফিসে গিয়ে উপস্থিত উপানন্দ। চার মাস আগের কাগজের ফাইল দেখে তিনি ঠিক বার করে নেন সেই অক্‌শনের তারিখ। আরো কিছুদিন সময় আছে হাতে। উপানন্দর আনন্দ আর ধরে না। ঠিক ঠিক কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। তাঁর কাছে যে সব জিনিষ আছে আর কেউ পারবে সে সব যোগাড় করতে?

গালগল্প সব বন্ধ হয়ে গেছে উপানন্দর। মস্কো-পিকিং হেলসিংকি-ওয়ারশ কোন কিছুই যেন আর তাঁর মনে নেই। আহার নিদ্রার কথাও যেন ভুল হয়ে গেছে। শুধু ডাকটিকিট আর ডাকটিকিট!

বাস্তবিকই রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুরানো কাগজওয়ালার কাছ থেকে ন'টাকায় যে সংগ্রহ তিনি উদ্ধার করেছিলেন তার কি তুলনা হয় কোন? সে সংগ্রহ হাত-ছাড়া করতে কি পারবেন তিনি?

ভাবতে ভাবতে বুক ফেটে যেন কান্না আসে উপানন্দর। কিন্তু যতোই কষ্ট হোক এর মায়া ছাড়তেই হবে তাঁকে।

একমাত্র কন্যা কল্যাণীর অভিমানও বাগচী মশাইকে কম আহত করে নি! যে কোন রকম দুঃখ সহ্য করতে তিনি প্রস্তুত কল্যাণীকে সুখী করার জন্যে।

মনকে ঠিক করে ফেলেন উপানন্দ। ইণ্ডিয়া টিকিটের পুরো সেটটাই তিনি নীলামে দিয়ে দেবেন। তার মধ্যে রাজবাড়ির কাগজপত্র থেকে পাওয়া টিকিটগুলো সত্যি সত্যি দুর্লভ। সিপাহী বিদ্রোহেরও আগেকার সে সব টিকিট।

কতগুলো পুরানো খাম আর পোস্টকার্ডের ওপর অদ্ভুত রকমের ঠিকানা পড়ে হেসে ফেলেছিলেন উপানন্দ। সত্যি সত্যি হাসিরই ব্যাপার। কুড়িয়েই আনা হোক আর কেনাই হোক, কোলকাতার আশপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত এসব পুরানো চিঠি। এসব চিঠির ঠিকানায় শুধু গ্রামের নাম আর ডাকঘরের নাম দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি পত্রলেখকেরা, প্রাপককে খুঁজে পেতে যাতে হয়রানি না হতে হয় ডাক-পিয়নকে তার জন্যে প্রাপকের আংগিক পরিচয়ও তারা দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

মহামহিম শ্রীযুক্ত হরিদাস চক্রবর্তী (অন্ধ) কিংবা খোঁড়া শ্রীমান্ মহম্মদ ইয়াসিন, পত্রের ঠিকানায় এমনি সব পরিচয় দেখে কার না হাসি পায়। সেকালে এভাবেই ঠিকানা লিখতে হতো চিঠিপত্রে। অনেক সময় ছবিও এঁকে দেওয়া হতো। পিয়নদের সুবিধা হতো তাতে। লেখাপড়া তো বড়ো জানতো না তারা।

এসব জিনিষ কি আর পাওয়া যাবে কোনদিন? ভাগ্যি, পুরানো কাগজওয়ালা রাজবাড়ির গুদাম সাফকরা কাগজপত্র বস্তা ভর্তি করে নিয়ে চল্‌ছিল তাঁর সামনে দিয়ে। তাইতো এই দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিটগুলো কোন রকমে রক্ষা পেয়ে গেছে। তা নইলে এগুলোর গতি যে কী হতো কে বলতে পারে!

উপানন্দ ভালো করেই জানেন, নীলামে তাঁর ইণ্ডিয়া সেটের ডাক উঠবে অনেক। অক্‌শনের সময় সত্যি তাই হয়। দেখতে দেখতে এগারো হাজার টাকা দর উঠে যায়।

এতোটা কিন্তু উপানন্দও আশা করেন নি। ন-টাকা খরচ করে এগার হাজার টাকা লাভ, একি বড়ো কম অভাবনীয় ব্যাপার! কিন্তু তবু এ অক্‌শন, লটারি।

কে জানে এ দেশের লোকের সুখদুঃখ আর কতোকাল এরকম ভাগ্যের খেলা হয়ে থাকবে?

কল্যাণীর বিয়ের সমস্যা, মৃন্ময়ীর গহনার দায়, সবই মিটে যায় দুমাসের মধ্যে। কিন্তু তবু কেন শান্তি নেই উপানন্দর মনে? সেই আগের মতোই তো দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট নিয়ে তিনি মেতে আছেন। কিন্তু তবুও যেন কেমন একটা ছাড়া-ছাড়া ম্রিয়মাণ ভাব।

তাঁর সেই অপূর্ব সংগ্রহের কথা ভুলতে পারেন না উপানন্দ। কন্যা বিদায় আর তাঁর ডাকটিকিটের ইণ্ডিয়া সেট বিক্রির ব্যথা ছুটোই যেন ঘুরে ফিরে বার বার এসে আক্রমণ করে তাঁর মনকে।

কল্যাণী আসবে। যখন ইচ্ছে তখনই তাকে হয়তো কাছে পেতে পারবেন উপানন্দ। কিন্তু সেই ইণ্ডিয়া সেটটাকে তো তিনি আর কোন দিন ফিরে পাবেন না।

ধোঁয়া

গুলী সুতোর লেবেলের মতোই টকটকে লাল চোখ দুটো।

হঠাৎ নজর পড়তেই থমকে দাঁড়ায় শংকর।

অনর্গল ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করে চলেছেন লোকটি। শংকর অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে।

হয় পাঁড় মাতাল, আর নয়তো বদ্ধ পাগল!—এই ধারণা হয় শংকরের আর দশজনেরই মতো। তবে লোকটির যে বেশ ভালো লেখাপড়া রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

গভীর আগ্রহ নিয়ে শংকর এগিয়ে যায় লোকটির সামনে। আর সঙ্গে সঙ্গেই আবৃত্তিও বন্ধ হয়ে যায়।

জাস্ট এ মিনিট!—এই বলে একটু থেমেই ভদ্রলোক চটপট একটা বিড়ি ধরিয়ে নেন এবং আবার আবৃত্তি সুরু করে দেন। এবার আবৃত্তি করেন ব্রাউনিঙ-এর 'দি লাস্ট রাইড টুগেদার' কবিতাটি।

অনুপম! ইংরেজির ছাত্র শংকর মুগ্ধ হয়ে যায় এই আবৃত্তি শুনে। বিস্তারিত জানার ইচ্ছে হয় তার লোকটির সম্বন্ধে। কিন্তু কাকে জিগ্যেস করবে সে? কাকে আবার কী জিগ্যেস করে মুশকিলে পড়বে, সেও এক ভয়। একেবারে নতুন লোক যে তারা বেলগেছে পাড়ায়।

হঠাৎ বৃষ্টি নামে। আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি। মেঘ ডেকে ওঠে মাঝে মাঝে কড়কড় শব্দে।

শংকর দৌড়ে গিয়ে ওঠে পাশের এক দোকানে।

ভদ্রলোক কিন্তু সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন। বেলগেছের মোড়ে একটা বড়ো বাড়ির দোতলার বারান্দার নীচে দাঁড়ানোয় মাথাটা তাঁর কোন রকমে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাচ্ছে বটে, কিন্তু ক্রমাগত বৃষ্টির ঝাপটায় জামা কাপড় তাঁর ভিজে একাকার। কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপই নেই যেন সে দিকে।

শংকর অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বৃষ্টি শীগ্‌গির থামবে, এমন কোন লক্ষণই নেই। বাইবেলের 'নোয়ার গল্প মনে পড়ে যায় তার। স্বয়ং ভগবান বুঝি আবার নতুন করে এক জলপ্লাবন পাঠালেন এই পৃথিবীতে। এই কোলকাতা শহরটাকে ডুবিয়ে দেবারই বুঝি তাঁর মতলব!

সত্যি সত্যিই রাজপথে হাঁটুজল জমে যায় দেখতে দেখতে। অবিরাম বারিবর্ষণে স্তব্ধ নগরী। ট্রাম বাস অচল।

শংকর অনন্যোপায়। তাই দোকানীর সঙ্গেই আলাপ জুড়ে দেয়। কিছুক্ষণ কথাবার্তায়ই বুঝতে পারে সে যে, পাড়ার গেজেট এই দোকানী। পাড়ার প্রায় সব খবরই তার নখদর্পণে।

তাই স্বাভাবিক। চৌরাস্তার মোড়ে একটি মাত্র বড়ো মুদির দোকান। আশপাশের প্রায় সবাইকেই আসতে হয় তার কাছে। কাজেই সকলের প্রায় সব কথাই তার জানা থাকার কথা।

দোকান ভর্তি লোক। দোকানীই ডেকে ডেকে এনেছে সকলকে। বৃষ্টি নামতেই ছুটোছুটি পড়ে গিয়েছিল কিনা!

"আপনাদের সকলের চরণে আশ্রয় পেয়েই চরণ বৈরাগী বেঁচে আছে। আর তার দোকান থাকতে আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে জলে ভিজবেন, সে কি হয় কখনো? আসুন

সবাই, ভেতরে আসুন।”—এই বলে দোকানী অভ্যর্থনা জানিয়েছে সকলকে।

ভারি রসিক লোক চরণ বৈরাগী। কথায় কথায় বৈষ্ণবী বিনয়ে নিজেকে চরণদাস বলে পরিচয় দিয়ে সকলের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছে সে। বয়সে প্রৌঢ়। মাথার চুলে পাক ধরেছে। মাঝখানে একটি বৃত্তাকার চক্‌চকে টাক। সবাই খুশিই হয় তার কথাবার্তায়।

এ সব দেখে শুনে শংকর ভরসা পায় কতকটা। চরণকে জিগ্যেস করলেই বোধ হয় ঐ ভদ্রলোক সম্বন্ধে মোটামুটি জানা যাবে! সেই ভরসাতেই শংকর জিগ্যেস করে দোকানীকে এবং সে নিরাশও হয় না মোটেই।

বর্ষণমুখর সকাল। রবীন্দ্রনাথের ‘একটি আষাঢ়ে গল্পের’ মতোই উপাদেয় লাগে চরণ বৈরাগীর বলা গল্প। সবাই উৎকর্ণ হয়ে শোনে। চরণ বলে চলে—

বেশ ভালো ঘরেরই ছেলে ঐ ভদ্রলোক। ওঁর বাবা যখন ঢাকায় বদলি হয়ে যান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে উনি তখন বি-এ ক্লাসের ছাত্র। বাপ কোলকাতাতেই ছেলেকে রাখা স্থির করেন। তাঁকে হোস্টেলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে যান। লেখাপড়ায় তুখোড় ছেলে। অধ্যাপকদের সবারই প্রিয়। কাজেই নির্ভাবনায়ই বাপ কোলকাতায় রেখে গেলেন ছেলেকে। কিন্তু ভাবনার খবর বাপের কাছে পৌঁছুতে খুব বেশি সময় লাগলো না। যে ছেলে বিরাট ভবিষ্যতের জন্যে নিজেকে তৈরি করে চলছিলেন, যাঁর স্বপ্ন ছিল বিরাট কিছু একটা হবার, সেই ছেলে যে কী করে বখাটে ও আড্ডাবাজ একদল ছেলের সঙ্গে ভিড়ে পড়লেন, তা কেউ বলতে পারে না। শুধু যে লেখাপড়াতেই

ভালো ছিলেন ভদ্রলোক তা নয়, স্বভাব চরিত্রের দিক থেকেও আত্মীয় স্বজন সবাই নাকি ওকে দেবতুল্য বলে মনে করতো। এমন ছেলে কলেজ কামাই করে সিনেমা দেখায় মেতে উঠলেন। বড়ো বড়ো রেস্তোরাঁয় যেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে টাকা ওড়াতে সুরু করলেন জলের মতো। ট্যাক্সি ভাড়া করে শহরের কুখ্যাত অঞ্চলগুলোতেও যাতায়াত চলতে থাকে।

আহা হা! মা-বাপের টাকা এমনি ভাবে উড়িয়েছে? খুব সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করেন এক বৃদ্ধ।

হ্যাঁ, তাইতো শুনেছি।

তারপর কী হলো বলুন।—আর একজন অস্থির আগ্রহে প্রশ্ন করে চরনদাসকে।

এমনও নাকি অনেক দিন গেছে শুনেছি, যখন উনি রাত্রিবেলা হোষ্টেলেই ফেরেন নি। হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অপেক্ষা করে করে দরজা বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিতেন দারোয়ানকে। কলেজের শাসনে কোনই ফল হয় না। প্রিন্সিপ্যালের কাছে এমন খবরও আসে যে, পার্ক সার্কাস পাড়ায় ওঁকে নাকি একটা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় প্রায়ই।

ব্যস্, একেবারে ষোলকলা পূর্ণ তা হলে! আরে একবার অধঃপতনের পথে পা বাড়ালে তাকে আর ফিরিয়ে আনা কি সহজ ব্যাপার?—বৃদ্ধ আবার এক মন্তব্য করেন।

আপনি থামুন না একটু, ওকেই বলতে দিন। আসল ব্যাপারটা শোনা যাক্, কী করে ও বেচারার এ হাল হলো।—চরণের কথার মাঝখানে কথা বলায় শংকর বিরক্ত হয়ে ওঠে।

বেশ ভাই, বেশ, আমি থেমেই যাচ্ছি।—বৃদ্ধ চুপ করে যান।

চরণ আবার বলতে সুরু করে।

ছেলেটিকে কিছুতেই বাগে আনতে না পেরে প্রিন্সিপ্যাল চিঠি লিখে বিস্তারিত জানিয়ে দেন তাঁর বাপকে। বাপের মাথায় তো বজ্রপাত একেবারে! ঢাকায় নিজের কাছে তিনি নিয়ে গেলেন ছেলেকে। তাঁকে ভর্তি করিয়ে দিলেন সেখানকার কলেজে।

তাতে ফল হলো কিছু?—আর এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন।

ফল যা শেষ পর্যন্ত হয়েছে তাতো দেখতেই পাচ্ছেন। তবে ছেলেকে ভালো পথে নেবার জন্যে চেষ্টার চূড়ান্ত করেছেন বাপ। কোলকাতা থেকে ছেলেকে ঢাকায় নিয়ে যাবার কিছু দিনের মধ্যেই বেধে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। আর দেখতে দেখতে কোলকাতায় জাপানী বোমারও যে কী আতংক দেখা দিল তা আর বলার নয়।

কাতারে কাতারে লোক সব কোলকাতা ছেড়ে পালাতে সুরু করলে এদিক ওদিক। এই শহর একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবার উপক্রম আর কি! এরই মধ্যে কোলকাতা থেকে এক চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন ভদ্রলোকের বাবা। চিঠি লিখেছেন রেংগুন-প্রবাসী তাঁর এক পুরানো বন্ধু। সবাই যখন কোলকাতা ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত, সে সময় তিনি রেংগুন থেকে সপরিবারে প্রাণ নিয়ে কোলকাতায় ফিরতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছেন। কিন্তু এই খালি শহরে কী করে থাকবেন তিনি? তাই পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখেছেন ঢাকায় তাঁর বন্ধুর কাছে।

কিন্তু এ ব্যাপারের সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকের কী সম্পর্ক? —চরণদাসের এক খদ্দের জানতে চায়।

সম্পর্ক আছে বৈ কি। এঁর বাবা তাঁর বন্ধুকে চিঠি লিখে জানালেন ঢাকায় যেয়ে নতুন করে ওকালতি শুরু করতে। রেংগুনের একজন প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ আইনজীবীর পক্ষে ঢাকায় যেয়ে পসার করতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না, এই তাঁর মত। বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করেন তিনি। ঢাকায় যেয়ে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। বুড়িগংগার তীরে নবাগত উকীলের বাড়িতে ক্রমশই মক্কেলের ভিড় বেড়ে চলে। আইন আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলে পুলকেশ পাকড়াশি পরিচিত হয়ে যান অল্পদিনের মধ্যেই। এরই মধ্যে একদিন ডেপুটি বন্ধু সতীশ রায় তাঁর মনের কথাটা খুলে বলে ফেল্লেন পাকড়াশিকে। তাঁর ভারি ভালো লেগেছে মধুচ্ছন্দাকে। তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর—দুজনেরই খুব ইচ্ছে ছন্দাকে বৌ করে নেন ঘরে। তা ছাড়া বন্ধুত্বকে আত্মীয়তার বন্ধনে পাকা করে নিতে চান তিনি। এতে আর আপত্তি করার কী থাকতে পারে? সতীশ রায় যেচে নিতে চান তাঁর মেয়েকে ছেলের বৌ করে, সে তো সুখের কথা। পাকড়াশি এক কথাতেই রাজি।

ডেপুটির ছেলে প্রমীল সেবারেই বি-এ পাশ করেন ঢাকা থেকে! কিন্তু পাশ করেন অতি সাধারণভাবে। তা হবে না তো আর কী হবে? যত ভালো মাথাই হোক না কেন, বদখেয়ালগুলো তো আর মাথা থেকে পুরোপুরি যায় নি। যুদ্ধের ডামা-ডোল আর কলেজ অদলবদলের জন্যেই পরীক্ষার ফল খারাপ হয়েছে বলে চালু করে দেন সতীশ রায়।

বিয়ে হয়ে যায় মধুচ্ছন্দার সঙ্গে প্রমীলের। দুপক্ষই মনে করলেন রায়-পাকড়াশি পরিবারের বন্ধুত্ব এবার থেকে একেবারে পাকা। দুপক্ষই খুশি।

আচ্ছা, সতীশ রায় একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে নিজের বন্ধু-কন্যার সর্বনাশ করলেন এ ভাবে?

কী করে তিনি সর্বনাশ করলেন বন্ধু-কন্যার? ছেলের মাথা খারাপ হয়ে গেলেও ছেলের বৌকে তিনি মোটেই বঞ্চিত করেন নি। বরং তার জন্যেই তিনি সব কিছু, এমন কি অনাথ দেব লেনের বাড়িখানা পর্যন্ত লিখে পড়ে দিয়ে গেছেন বৌমার নামে। নিজের সম্পত্তির কিছু অংশ একমাত্র মেয়েকে দেবার কথাও তিনি একবার ভাবেন নি।

আরে ছেড়ে দাও ভাই চরণদাস, তুমি বুড়োদার কথায় আর কান দিও না। কী করে এই বেচারা এমন পাগল হয়ে গেল তাই বেশ বিস্তারিতভাবে বল দেখি, শুনি।—আর একজন বয়স্ক লোকের এই কথায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু যেন অপমানই বোধ করেন।

আচ্ছা, এবার চলাই যাক তা হলে। তোমরাই শোন বসে বসে।—এই বলে বৃদ্ধ বেরিয়ে পড়েন দোকান থেকে। বৃষ্টি তখন ঝিমিয়ে এসেছে।

বাঁচা গেল! বুড়ো মানুষ কিছু বলাও চলে না। অথচ বার বার কী রকম ইণ্টারফিয়ার করছিলেন!—বৃদ্ধ চলে যাবার পর মন্তব্য করে শংকর।

ওদিকে নাটকীয় ভংগীতে কী যেন বলে চলেছেন প্রমীল রায়। বৃষ্টির জোর কমে যাওয়ায় শোনা যাচ্ছে কিছু কিছু ঃ

লাইফ্ ইজ বাট এ ওয়াকিং শ্যাডো······একটু মন দিয়ে শুনলে মাঝে মাঝে বেশ পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায়। শেক্স্‌পিয়ারের ম্যাকবেথ যেন সত্যি সত্যি অভিনয় করছেন, এমনি আবৃত্তি প্রমীল রায়ের!

শংকর অভিভূত হয়ে শোনে। কিন্তু পরক্ষণেই অভিনয়

বন্ধ হয়ে যায়। নতুন করে একটা বিড়ি ধরাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন অভিনেতা। একটু দম নিয়ে নিচ্ছেন হয়তো।

চরণদাসকে আবার গল্প বলা সুরু করতে হয় শংকরের তাগিদে।

বিবাহিত জীবনের সুরুতে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল ভদ্রলোকের। স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে বড়ো বড়ো চাকরির উমেদারি করতেও তাঁকে দেখা গেল। কিন্তু চাকরি আর হয়ে ওঠে না। কেউ কোন ছোট কাজের প্রস্তাব করলে তিনি কথাই বলেন না। অথচ বড়ো কাজের আশায় বারে বারে কোলকাতায় যেয়ে ঘুরে ফিরে আসেন। অনেক টাকাও নষ্ট হয় তাতে। বাপ সন্দেহ করেন। আবার সেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটা হাত করে ফেলে নি তো ছেলেকে? তা না হলে এতোগুলো করে টাকা খরচ হবার কী কারণ থাকতে পারে? রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। কিন্তু এ নিয়ে বাড়িতে কোন কথা বলারও উপায় নেই। পাছে তাঁর বৌমা মনে ব্যথা পান, এই ভয়। অথচ বৌমারও মনে যে সন্দেহ উঁকি ঝুঁকি না মারছে তা নয়। তবে নানা ব্যাপারে মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করলেও সে চেপে রাখে মনের সে সন্দেহ। কিন্তু ভদ্রলোকের বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, তার স্ত্রীও তাঁকে সন্দেহ করতে সুরু করেছেন। চিন্তা তাঁর বেড়ে চলে।

এর মধ্যে এক আনন্দের ঘটনাও ঘটে। একটি পুত্রলাভ ঘটে ভদ্রলোকের। শ্বশুরবাড়িতে ছেলের মুখ দেখতে গেলে চারদিক থেকে চাপ পড়ে ভদ্রলোকের ওপর কিছু খরচপত্র করার জন্যে। কিছু নয়, বেশ খরচপত্র করেন তিনি সেখানে এবং সবার পীড়াপীড়িতে শ্বশুরালয়েই থেকে যেতে হয় তাঁকে সে

রাতের জন্যে। বিপদও ঘটলো সেখানে থেকে যাওয়ার ফলেই।

সে কী কথা? শ্বশুরবাড়িতে থাকায় আবার বিপদ ঘটে কী করে?—বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করে শংকর।

বিপদ কী করে ঘটলো সে কথাই বলছি, এই বলে আবার আরম্ভ করে চরণদাস। পুত্রলাভের আনন্দোৎসবের ঘটাটা বোধ হয় একটু বেশিই করে ফেলেছিলেন ভদ্রলোক। তাতে শ্বশুরবাড়ির আর সবাই খুশি হলেও শ্বশুর-কন্যা নিজে কিন্তু খুব সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। স্ত্রী স্পষ্টই নাকি তাঁকে বলেছেন, বেকার হয়েও এ ধরণের খরচপত্র করে অন্যের কাছে বাহবা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এতে আত্মসম্মানের কোন পরিচয় নেই। বাপের টাকায় বাহাদুরি করাও কোন শিক্ষিত মানুষের কাজ নয়। স্ত্রীর এ কথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন ভদ্রলোক এবং এ নিয়ে একটু কথা কাটাকাটিও হয়েছে দুজনের মধ্যে। রাত ভোর হবার আগেই ভদ্রলোক সেই যে বেরিয়ে এসেছেন শ্বশুরবাড়ি থেকে আর সে পথে নাকি এগোন নি কোন দিন।

ওঃ, তার জেরই বুঝি চল্‌ছে আজ অবধি। ভারি সেন্টিমেণ্টাল তো ভদ্রলোক! স্ত্রীর কথায় কেউ যে এমনি পাগল হয়ে যেতে পারে ভাবতেই পারে না শংকর।

আনন্দ উৎসবের দিনে স্ত্রীর কাছ থেকে ওরকম কথা শুনলে যে কোন লোকেরই শক্‌ড্‌ হবার কথা। নিজের চারিত্রিক অধঃপতনের জন্যে বেচারা হয়তো এমনিতেই মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। তার ওপর বেকার জীবনের লাঞ্ছনা ও অপমান। এসব সাত পাঁচ চিন্তা করতে করতেই ভদ্রলোকের মাথাটা হয়তো খারাপ হয়ে গিয়ে থাকবে।—আর একজন বলেন এ কথা।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সতীশ রায় রিটায়ার করেও বছর দুই ছিলেন ঢাকায়। যুদ্ধ শেষ হবার পর কোলকাতায় বাড়ি করে তিনি চলে আসেন বেলগেছেতে। ছেলের জন্যে অশান্তির শেষ ছিল না রায় মশাইয়ের। বহু খরচ-পত্র করেও কোনই ফল পান নি। চরম অশান্তি নিয়েই তিনি মারা গেছেন বছর দুই আগে।—চরণদাস তার গল্প শেষ করে এই বলে।

বৃষ্টি ভালো করে থামতে না থামতেই দোকানে খদ্দেরদেরও ভিড় জমে উঠেছে ততক্ষণে।

এদিকে শংকর ফিরে যেতে যেতে শুনতে পায় প্রমীল রায় তখনও বেশ জোরে জোরেই আবৃত্তি করে চলছেন ঃ

উইমেন আর এঞ্জেলস্ উইংস্······
মেন প্রাইজ দি থিঙ্ আনগেইনড্ মোর
দ্যান ইট ইজ।

তারপর আবার বলেন ঃ অলমোষ্ট এভ্রিবডি
ইজ আন্এম্প্লয়েড টুডে। ডোন্ট ওরি।

বেকার জীবনের ব্যথা যে কী শংকর তা ভালো করেই জানে। আজো যে তার একটা ইন্টারভ্যু রয়েছে বেলা দুটোয়। আর সবগুলোর মতোই এরও যে কী ফল হবে সে বিষয়েও সে এক রকম নিঃসন্দেহ। কাজেই প্রমীল রায়ের অবস্থাটাই বার বার ভেসে ওঠে তার মনে।

মূল্য

বাতাসে তখন ভীষণ ঝড়।

মহা সমস্যায় পড়ে যান কেদার সামন্ত। কী করে যে বাড়ি ফিরবেন শুধু সে চিন্তাই নয়, কখন কার সঙ্গে আবার এই বে-পাড়ায় হঠাৎ দেখা হয়ে যায় সেই দুশ্চিন্তা!

জানালার একটি পাট সামান্য একটু ফাঁক করে বাইরের অবস্থাটা একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করেন সামন্ত। কিন্তু আকাশে বিদ্যুতের সে কী দারুণ আস্ফালন! বৃষ্টি তো আছেই। নিরুপায় হয়ে তাই বসে পড়তে হয় তাঁকে।

মামলার ব্যাপারে বাড়িটা যতোটুকু দেখেশুনে নেওয়া দরকার তাতো অনেক আগেই শেষ করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু সাবিত্রীর মা নাছোড়বান্দা, কিছু না খাইয়ে ছাড়বে না। সেই ভোজন-পর্ব সমাধা করতে যেয়েই এই বিপদ।

খেতে বসে সামন্ত কেবলি ভাবছিলেন সাবিত্রীর মায়ের কথা। সাধারণ বেশে লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে গীতা পাঠ! পুজোর আসনেই নাকি প্রায় সর্বক্ষণ বসে থাকে আজকাল। দোতলা থেকে নীচে নামার সাধ্য নেই। তাই ওপরে যেয়েই তার সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে সামন্তকে। একে বয়েসও হয়েছে অনেক, তার ওপর আবার নিম্নাংগ অবশ। এ অবস্থায় দোতলা-একতলা করা সম্ভবও নয়। আর সর্বাংগ যে অবশ হয়ে যায়নি তাই রক্ষে। ও দেহের ওপর দিয়ে কতো রকমের ঝড় গিয়েছে সারা জীবন ধরে! এখন পুজোআর্চায় দিন কাটিয়ে যদি কিছু পাপ কাটে!

সে যা হয় হবে। কিন্তু চায়ের কাপ শেষ না হতেই অকস্মাৎ কোথা থেকে যে এই ঝড়ের আবির্ভাব ঘটলো তাই ভেবে পান না সামন্ত। এরকম মুস্কিলে এর আগে আর কোনদিন পড়েছেন বলেও তিনি মনে করতে পারেন না।

তবু ভালো সাবিত্রী ওপরে চলে গেছে ঘরদোর গোছাতে বা অন্য কোন কাজে। বাইরের কেউ হঠাৎ এসে পড়লে আর সাবিত্রীর সঙ্গে একা একা তাঁকে গল্প করতে দেখলে কী ধারণা হতে পারে যে কোন লোকের তা ভাবতেও যেন আঁৎকে ওঠেন সামন্ত। তবে এই দারুণ দুর্যোগে কেউ হয়তো আর এ সময়ে আসবে না বা আসতে সাহস করবে না, এই বলে মনকে খানিকটা আশ্বস্ত করে নিয়েছেন তিনি। এই প্রসংগে তাঁর কবিবন্ধু সনাতন চক্রবর্তীর কিছুদিন আগেকার একটি স্মরণীয় বাণীও হঠাৎ মনে পড়ে যায় সামন্তর।

চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'এমনি সুনামের পুঁজি করে বসে আছ ভায়া যে, এখন যদি তুমি একদম বকেও যাও তবু কেউ তা বিশ্বাস করবে না। আর আমার এমন পোড়া কপাল, আমি দেবতা সাক্ষী করে চৌদ্দ পুরুষের নামে দিব্যি দিয়েও যদি পঞ্চ 'ম'-কার ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করি তা হলেও আমার মাতাল আর দুশ্চরিত্র নাম ঘুচবে না।'

চারিত্রিক সুনাম রক্ষায় কেদার সামন্তর অত্যধিক সতর্কতা ও সর্বক্ষণ সাবধানতার জন্যে ঠাট্টা করেই সেদিন এ কথাটা কথায় কথায় বলেছিলেন সনাতন চক্রবর্তী।

কিন্তু চারিত্রিক সুনাম রক্ষায় এতো সতর্কতা সত্ত্বেও সামন্তকে যে অন্য কোন্ আকর্ষণ এই কুখ্যাত অঞ্চলে টেনে নিয়ে আসতে পারে তা কিন্তু তাঁর বন্ধু মহলেও অজ্ঞাত।

টাকা পয়সা বা অন্য কোন লোভ দেখিয়েও সামন্তকে কেউ কোনদিন এ সব এলাকায় আনবার চেষ্টা করে নি। কাজেই আজ যে তিনি নিছক ব্যবসার খাতিরেই এখানে এসে আহার বিহার ও গালগল্প সুরু করে দিয়েছেন একথা কে সহজে বিশ্বাস করবে? তাছাড়া পয়সার লোভে তাঁকে এ পাড়ায় আসতে হয়েছে বলেই যে এই রাত্রিতে এতোক্ষণ ধরে এখানে থাকতে হবে, একথাটা ভাবতেই ভারি বিশ্রী লাগছে তাঁর!

এর আগের মামলাটাও সাবিত্রীর হয়ে লড়েছিলেন কেদার সামন্ত। সে মামলায় জিতেওছিলেন।

নতুন গয়না তৈরির টাকা দেওয়া না দেওয়া নিয়ে ঝগড়া বেধে গিয়েছিল স্যাকরার সঙ্গে। সাবিত্রী বলছে একশ টাকা সে আগাম দিয়েছে। কিন্তু স্যাকরা বলছে কোনও আগামই দেওয়া হয় নি। বাদানুবাদের সুরু হয়েছিল এই নিয়ে। সে ব্যাপারটাকে কোর্ট পর্যন্ত গড়াতে দেবার ইচ্ছে ছিল না সাবিত্রীর। সাবিত্রী নিজেই বলেছে এ কথা কেদার সামন্তকে।

একশ টাকা কী এমন একটা ব্যাপার যার জন্যে মামলা মোকদ্দমা করে সময় ও স্বাস্থ্য নষ্ট করতে হবে? এই ছিল সাবিত্রীর মনের কথা। কিন্তু স্যাকরা তর্কবিতর্কে মাথা গরম করে এমন দু একটা অশ্লীল কথা বলে ফেলেছিল এবং সাবিত্রীর চরিত্রের ওপর ইংগিত করেছিল যা আর সহ্য করা সম্ভব হয় নি সাবিত্রীর পক্ষে। স্যাকরাকে সায়েস্তা করার জন্যে তাই ভীষণ জেদ চেপে গিয়েছিল তার। কেদার সামন্তকে দিয়ে একটা পেটি কেস ঠুকে দিয়ে সেবার সে বুঝিয়ে দিয়েছিল স্যাকরাকে যে তার ক্ষমতা কতো।

সেই পেটি কেসের ব্যাপার নিয়েই সাবিত্রীর সঙ্গে সামন্তর প্রথম পরিচয়।

অশ্লীল কথায় অরুচি ও চরিত্রের ওপর ইংগিত করায় বিরক্তি, একজন গণিকার পক্ষে এ যে কী করে সম্ভব হতে পারে সামন্ত সেদিন অনেক ভেবেও এর কোন কূল কিনারা করতে পারেন নি। বরং মনে মনে হাসিই পেয়েছিল সাবিত্রীর জেদ দেখে। সামান্য একশ টাকার জন্যে যে মানুষ স্ত্রীলোকের সম্মান রেখে কথা বলে না তাকে ভালোভাবে শিক্ষা দিয়ে দেওয়া দরকার। একজন পতিতার মুখে এরূপ নীতিকথা অস্বাভাবিক শোনায় বৈকি!

তবে পতিতা হলেও নাম যে তার সাবিত্রী। নামের সঙ্গে কথার সংগতি একটু থাকবে না? আর বাইরে সতীত্বের একটা বোরখা রেখে চলতে পারলে যদি তাতে লাভের আশা বেশি থাকে তাহলে সে সুযোগটাই বা সাবিত্রী কাজে লাগাবে না কেন?

তবে এটা কিন্তু বেশ লক্ষ্য করার বিষয়! সাবিত্রীর বৈঠকখানায় বসেই সাবিত্রী সম্বন্ধে ভাবতে থাকেন কেদার সামন্ত। দেখতেও যেমন, চাল-চলনে এবং কথাবার্তায়ও ভারি ভদ্র কিন্তু সাবিত্রী।

কোর্টে হাকিমও সাবিত্রীকে প্রথমটায় বিশ্বাস করতে চান নি গণিকা বলে। খুব উঁচুদরের ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়েছিল তাকে। হাকিম তাই তার উকীলকে বিস্মিত হয়েই জিগ্যেস করেছিলেন সাবিত্রী সম্বন্ধে।

উকীল কেদার সামন্ত নিরুপায়। সাবিত্রীর সত্য পরিচয়ই দিতে হয়েছিল তাঁকে! গণিকা-কন্যার পক্ষে তার জন্মগত বৃত্তি এড়িয়ে চলা যে বড়ো সহজ ব্যাপার নয়, সে কথাটাই বলেছিলেন সামন্ত।

তাতে ফল খারাপ হয় নি। বরং ভালোই হয়েছিল একদিক থেকে। হাকিমের সহানুভূতি পুরোপুরি সাবিত্রীর

দিকেই এসে গিয়েছিল। রায়ও হয়েছিল তার পক্ষেই।

তার ফলেই তো এবারকার মামলাও সামন্তকেই হাতে নিতে হয়েছে!

লোকনিন্দার ভয়ে এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা করেছিলেন সামন্ত। কিন্তু সাবিত্রীর পীড়াপীড়িতে আর তা সম্ভব হয় নি। তবে মামলা হাতে নিলেও মন থেকে ভয় কাটে নি। বড্ড ছোঁয়াচে জাত যে ওরা! তার ওপর আবার রামবাগানে সাবিত্রীদের বাড়িতে এসেই উঠতে হয়েছে একেবারে! ভয় থাকবে না তো কী!

বৃষ্টি থেমে গেছে, উকীলবাবু! বৈঠকখানায় ঢুকে সামন্তকে বলে সাবিত্রী।

মেহগনি কাঠের শেলফ থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে দেখছিলেন সামন্ত। তন্ময় হয়ে দেখছিলেন। সমস্ত ভয়-ডরের কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত বইই ভারি সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে শেলফে। এমন কি স্বামী বিবেকানন্দর বইও দু-চারখানা। ইংরেজী বইও যে নেই, তাও নয়। কিন্তু কেন? এ বাড়িতে আবার বই পড়তে কে আসবে? সাবিত্রীরই পড়ার অভ্যাস আছে নাকি?

পর পর অনেকগুলো জিজ্ঞাসাই উঁকি মারে সামন্তের মনে। ঠিক তেমনি সময়েই সাবিত্রী এসে এক ডাকে চমক ভেংগে দেয় সামন্তর।

এই যে, তুমি ডাকছো! হ্যাঁ, বৃষ্টি তো থেমেই গেছে দেখছি। এবার ধীরে ধীরে কেটে পড়া যাক তা হলে। আবার কখন ঝড় বাদলা নেমে আসবে বলা যায় না তো কিছু। ঐ দেখ, আকাশের মেঘ এখনো কাটে নি।—সামন্তর কথায়

সাবিত্রী আকাশের দিকে চেয়ে দেখে, কথাটা ঠিকই বলেছেন উকীলবাবু।

সামন্ত মশাই, আপনাকে এভাবে যেতে দেওয়া হবে না। আর একটু বসুন, দেওকীপ্রসাদজীর গাড়ি এক্ষুনি এসে পড়বে। সে গাড়িতেই আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। আর যদি খুব তাড়া থাকে আপনার, তা হলে একটা ছাতা নিয়ে যান অন্তত।

না, না, আমাকে এখুনি যেতে হবে। আর একটুও দেরি করা চলবে না। বাড়িতে হয়তো কতো মক্কেল এসে বসে আছে, গিয়ে দেখবো। দাও, একটা ছাতাই আনিয়ে দাও, এখনো ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি পড়ছে দেখছি।—জানালার বাইরে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বৃষ্টির অবস্থাটা অনুভব করে নেন সামন্ত।

এই ভজা, উকীলবাবুর জন্যে একটা ছাতা নিয়ে আয় তো তাড়াতাড়ি।—বাইরে থেকে এক ঠোঙা ভাজাভুজি কিনে নিয়ে এসে দোতলার দিকে দৌড়ে উঠতে যাচ্ছিল এক-হাত-কাটা ভজা চাকর। তাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ করে সাবিত্রী।

কিন্তু যাই বলেন উকীলবাবু, আমার মনে হয় গাড়িটাড়ি কিছুই পাওয়া যাবে না এখন। আর একটু দেরি করে গেলেই পারতেন। দেওকীপ্রসাদজী এই এলেন বলে। রাত দশটা বাজতেই তিনি এসে পড়েন।—সাবিত্রী আবার আটকাতে চায় সামন্তকে।

কিন্তু সামন্ত তো দেওকীপ্রসাদের নাম শুনেই আঁৎকে ওঠেন। তাঁর এক বড়ো মক্কেলও তো আছে ঠিক এই নামের। যদি সেই লোকই হয়ে বসে তা হলে উপায়!

কে তোমার এই দেওকীপ্রসাদজী, বল তো।—সামন্ত জিগ্যেস করেন।

আরে আপনি দেওকীপ্রসাদজীর নাম শোনেননি উকীল বাবু! যুদ্ধের বাজারে স্ক্র্যাপ আইরণের কারবারে বহুৎ টাকার মালিক হয়েছেন যিনি। বেলুড়ে বিরাট তাঁর কারখানা। আমার যে তিনি বাঁধা খদ্দের।

ব্যাস্, আর শোনার দরকার নেই কিছু। ঠিকই সেই লোক। তাঁরই মক্কেল। কিন্তু তাঁর যে এ বিত্তে আছে, এ পাড়ায় আনাগোনা আছে, তা তো জানা ছিল না সামন্তর! যাক্‌গে, মানে মানে সরে পড়াই ভালো। দেখা হয়ে গেলে সে আবার তাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে বসে!—সামন্ত যখন এ ধারায় ভেবে চলেছেন ঠিক সেই সময়ই ভজা একটি ছাতা নিয়ে এসে তাঁর সামনে হাজির।

বেশ এবার যাই তা হলে।—সামন্ত উঠে পড়েন।

এই যে আপনার যাবার ভাড়াটা!—সাবিত্রী তার মুঠো খুলে দশ টাকার একটি নোট এগিয়ে দেয় উকীলবাবুর হাতে। তারপরেই জিগ্যেস করে, আচ্ছা আপনি কী ভাবছিলেন যেন?

না, তেমন কিছুই নয়। ঐ বইগুলো দেখে তোমার পড়াশুনোর দিকে খুব ঝোঁক আছে বলে মনে হলো।—দেওকীপ্রসাদ্জীর প্রসংগটা আর না তুলে কথাটা ঘুরিয়ে নেন সামন্ত।

হ্যাঁ, উকীলবাবু! ছোট বেলা থেকেই বই পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। মা আমায় কলেজ অবধি লেখাপড়াও করিয়েছিলেন। বি-এ পাশ করবো, খুবই ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু......।

কিন্তু বলেই থেমে যায় সাবিত্রী। তার চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে।

বৃত্তিগত ব্যবসাই যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাবিত্রীর শিক্ষার পথে, এ কথাটা ধরে নেন সামন্ত।

সাবিত্রী তবু বলে, মা-ই আমায় উৎসাহ দিয়েছিলেন লেখাপড়া শিখতে। আই-এ পাশ করার পর তাঁরই উৎসাহে বি-এ ক্লাশে ভর্তিও হয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিন যেতেই লক্ষ্য করলাম, ক্লাসে যেন সবাই আমায় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। আমার সন্দেহ হলো, আমার পরিচয়টা হয়তো জানাজানি হয়ে গিয়ে থাকবে, তাই এ অবস্থা। মনে খুব দাগা পেয়েছিলাম সে সময়। তবু সে ব্যথাকে বুকে নিয়েই ক্লাস করে চলছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হতো, সহপাঠিনীদের মধ্যে অনেকেই তো আই-এ ক্লাসে আমার সঙ্গে পড়েছে। তাদের সবার কাছ থেকেই তো বন্ধুর মতো ব্যবহার আমি পেতাম। সে ব্যবহার আর তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না কেন, প্রথম প্রথম তা দেখে আমি বিস্মিত হতাম। কিন্তু পরে আমি নিজের যুক্তি দিয়েই সব দিক বিচার করে এর কারণ বার করে নিয়েছি। বি-এ ক্লাসের সব ছাত্র-ছাত্রী সবাই মোটামুটি বেশ বয়স্কা। আমার পরিচয়টা জানাজানি হবার পর আমার সঙ্গে মেলা-মেশায় তাদের মনে একটা সামাজিক ভয় দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। তাদের অভিভাবকদের দিক থেকেও বাধা-নিষেধ এসে থাকতে পারে। এমন কি কলেজ কর্তৃপক্ষ বা অধ্যাপকদের তরফ থেকে আমার সম্পর্কে ছাত্রীদের প্রতি সতর্ক ও সাবধান হবার উপদেশ বা নির্দেশ আসাও অসম্ভব কিছু নয়। এই ধরুন না কেন, আপনার মতো একজন প্রবীণ ও বিজ্ঞ লোককেও যখন একটা মামলার কাজে এ বাড়িতে আনতে এতো অনুরোধ উপরোধের প্রয়োজন হয়েছে তখন ভদ্রঘরের বয়স্কা মেয়েরা আমার সহপাঠিনী হলেও সমাজের ভয়ে আমাকে যে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

আরে, এর মধ্যে আবার আমায় টেনে আনছো কেন তুমি?—উকীলবাবু একটু হকচকিয়ে ওঠেন নিজেন প্রসংগ এসে পড়ায়।

না, না, সেজন্যে আপনাকে কিছুই বলছি না আমি। সবাইকে বাদ দিয়ে তো আর আপনি নন। সমাজের দশজনের একজন আপনি। কাজেই আমাদের এ অবস্থার জন্যে দু চারজনকে দায়ী করে কোন লাভ নেই, দায়ী সকলে। এমন কি আমার মাও। কারণ শেষ পর্যন্ত মা-র কথাতেই আমাকে কলেজ ছাড়তে হয়েছে।

ও, পড়াশুনো একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ তা হলে?—উকীল বাবুর জিজ্ঞাসায় আক্ষেপের সুর।

হ্যাঁ, তা ছাড়া আর উপায় কী? মা-র উপার্জনের বয়েস গিয়েছে বলে তিনি যেদিন আমায় অর্থোপায়ের পথে টানলেন সেদিনই আমার মনে হয়েছিল যে, এ পরিবেশ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে বার করা বড়ো সহজ নয়।

ওসব কথা থাক এখন। কার দায়িত্ব কি, দু-চার কথার আলোচনায় তা মীমাংসা হবার নয়। আমার ভারি সখ, রবীন্দ্রনাথের একটা গান বা কবিতা যা তোমার ইচ্ছে আমায় একটু ব্যাখ্যা করে শোনাও। তুমি কেমন পড়াশুনো কর তারও একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে, আমারও একটু রবীন্দ্র-কাব্য শোনা হবে।—এই বলে টি-পয়ের ওপর থেকে গীতাঞ্জলিখানা তুলে নিয়ে সামন্ত এগিয়ে দেন সাবিত্রীর হাতে। সেলফ থেকে এনে কুশন চেয়ারে বসে বসে আগে থেকেই তিনি নাড়াচাড়া করছিলেন এ বইখানা।

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধুলার তলে।'—

সাবিত্রী গীতাঞ্জলি থেকে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করে শোনায় উকীলবাবুকে।

তোমার এ ব্যাখ্যা শুনে আমার শুধু এ কথাই বলতে ইচ্ছে হয় সাবিত্রী, রবীন্দ্রকাব্যের এমন অনুভূতি রয়েছে যার মধ্যে, তার জন্যে তো এ পথ নির্দিষ্ট হতে পারে না, তার জীবন-পথ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন !

সাবিত্রী স্তব্ধ হয়ে যায় সামন্তর কথা শুনে। মুখ ফুটে কথা বেরোয় না খানিকক্ষণ।

আচ্ছা, এবার যাই তা হলে। এ মামলায়ও নির্ঘাত জিত তোমাদের। এই বলে ছাতাটা খুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়েন সামন্ত।

তাই যেন হয় উকীলবাবু। নমস্কার !—হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে সামন্তকে বিদায় দেয় সাবিত্রী।

সত্যি সত্যি তাই হয়। সাবিত্রীদেরই জিত হয় মামলায়।

বাড়ি পার্টিশানের মামলা। সাবিত্রীর মাসি হেরে যায়। মা ও মাসির মধ্যে ঝগড়া বেধেছিল একখানা ঘর নিয়ে। মামলা না করে তার মীমাংসা সম্ভব ছিল না।

সাবিত্রীর ঠাকুরমার আমলের বাড়ি। সাবিত্রীর মা ও মাসি এক সঙ্গেই জাত ব্যবসা চালিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু মাসির মেয়ে ছুটি ব্যবসায়ে নামার পর থেকে ঝগড়া-ঝাঁটি প্রায় লেগেই ছিল ছু দলের মধ্যে।

এদিকে সাবিত্রীর মা'র শরীরের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে হঠাৎ তার কিছু একটা হয়ে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। তা হলে মেয়েটা বিপদে পড়বে, মাসির সঙ্গে বোঝা-পড়ায় জুৎ করে উঠতে পারবে না, এই মনে করেই আদা-লতের আশ্রয় নিয়ে অন্তত বাড়িটার ব্যাপারে একটা ফয়সালা করে যায় সাবিত্রীর মা।

বাড়তি ঘরটা মোক্ষদা সুন্দরী অর্থাৎ সাবিত্রীর মা-র

ভাগেই পড়েছে। কারণ মোক্ষদা সুন্দরী তার ছোট বোন সারদা সুন্দরীর অনেক আগেই ব্যবসায়ে নেমেছে এবং সারদা ব্যবসা আরম্ভ করার আগেই এ বাড়ি তৈরির কাজও শেষ হয়েছে।

সামন্ত প্রমাণ করেছেন যে, এ বাড়ি তৈরি করতে মোক্ষদাকে অনেক টাকা দিতে হয়েছে। কারণ মোক্ষদার মা তখন বৃদ্ধা, আয় তখন তার নেই বললেই চলে, আর মোক্ষদার আয় দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ সারদার উপার্জনের বয়েসই হয়নি তখনো পর্যন্ত। কাজেই বাড়তি ঘরটা সারদার ভাগে কোন রকমেই পড়তে পারে না এবং ঐ বাড়তি ঘর ছাড়া যদি আর একখানা ঘরও মোক্ষদাকে দেওয়া হয় তাহলেও তা অন্যায় হয় না।

সামন্তর এই ক্ষুরধার যুক্তিকে মেনে নিয়েই হাকিম রায় দিয়েছেন মোক্ষদার পক্ষে।

এ মামলার পর অনেকদিন কেটে যায়। সাবিত্রীদের আর কোন খোঁজ খবরই রাখেন না সামন্ত। নিজের বয়েস হয়েছে। কাজ-কর্মে ভাঁটা পড়ে এসেছে। হঠাৎ একদিন সকালবেলা একখানা নেমন্তন্ন চিঠি হাতে নিয়ে সাবিত্রী নিজেই এসে হাজির সামন্তর বৈঠকখানায়।

সামন্তকে একেবারে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সাবিত্রী।

কী ব্যাপার, কিসের এ নেমন্তন্ন?—সাবিত্রী আবার ঘর-সংসার পেতে বসতে যাচ্ছে কিনা, তেমনি একটা সন্দেহ দেখা দিচ্ছিল সামন্তর মনে নেমন্তন্নের রকম দেখে।

না, ব্যাপারটা কিছুই নয়। আপনার কথাই ঠিক উকীলবাবু! আমার মা-ঠাকুমার পথ আমার পথ নয়। আমার জীবন-পথের সন্ধান আমি পেয়েছি।

এসব কী বলছো সাবিত্রী!—খুশিতে বিস্ময়ে যেন ভেঙে পড়েন সামন্ত। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে দেখেন, তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে পতিতা, লাঞ্ছিতা ও সমাজ-পরিত্যক্তাদের শিক্ষাদানের জন্যে 'মোক্ষদা বিদ্যাভবন' প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছে সাবিত্রী। তার মা-র ও তার নিজের সমস্ত সম্পত্তি সে উৎসর্গ করেছে এই মহৎ কাজে! আর এ প্রতিষ্ঠানের চলতি খরচ বহনে প্রতিশ্রুত হয়েছেন দেওকীপ্রসাদজী। এ জন্যে পাঁচ লক্ষ টাকার একটি ভাণ্ডার তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন।

এতো বিরাট ব্যাপার সহজে যেন বিশ্বাস হতে চায় না সামন্তর।

দেওকীপ্রসাদকে তুমি কিভাবে যে এতোটা হাত করলে তাই আমি কেবল ভাবছি মা! তার হাত থেকে বড়ো সহজে তো টাকা গলে না!—এই বলে আরো কথা বার করবার চেষ্টা করেন সামন্ত।

সাবিত্রী বলে চলে সেই বর্ষণমুখর সন্ধ্যার শেষাংশের কাহিনীঃ

সেদিন আপনি আমাদের বাড়ি থেকে চলে আসার আট দশ মিনিট পরেই দেওকীপ্রসাদজীর গাড়ি এসে উপস্থিত। ঐ কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার জীবনের গতিও এক রকম স্থির হয়ে গেছে। অন্যান্য দিনের মতো সাদর অভ্যর্থনা না পেয়ে দেওকীপ্রসাদজীর মনের অবস্থা যে সে সময় কী দাঁড়িয়েছিল তা আমি ঠিক ঠিক বলতে না পারলেও এ আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, কেমন একটা আতংক ও হতাশায় তিনি যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। আমার দেহ স্পর্শ করার সাহস আর হয়নি তাঁর সেদিন থেকে। তবু তিনি এসেছেন। আমায় না দেখলে সব কিছুই নাকি ব্যর্থ বলে মনে হয় তাঁর কাছে। তাই আমায় দেখবার সুযোগ থেকে আমি কোনদিন বঞ্চিত করিনি তাঁকে।

সাবিত্রী একটু থামে। তারপর আবার বলতে সুরু করে :

মা ভাবতেন আমার বাঁধা ব্যবসা ঠিকই চলেছে। কিন্তু দেহ ব্যবসার আকর্ষণ থেকে আমি মুক্ত হয়েছি সেই বর্ষণমুখর সন্ধ্যা থেকেই। আপনার দুটি কথাই আমায় সত্যিকারের জীবন-পথের সন্ধান দিয়েছে। তাই আপনাকেই প্রথম আমার প্রণাম জানাতে এসেছি আমার জীবনের আকাংক্ষিত কাজ আরম্ভ করার আগে। আপনার আশীর্বাদ ও সহযোগিতা থেকে যেন কখনো বঞ্চিত না হই উকীল বাবু!

আরে কী পাগলের মতো বলছো সাবিত্রী! এমন কাজে শুধু আমার কেন সবার কাছ থেকেই তুমি সমর্থন পাবে।

তাই যেন হয় উকীলবাবু!

নিশ্চয় হবে।

তা হলেও আপনার সমর্থনই আমি প্রথম আশা করছি।

তার জন্যে একটুও ভাবতে হবেনা তোমায় সাবিত্রী! এ যে কতো বড়ো মহৎ কাজে হাত দিয়েছ, তা নিজেই হয়তো তুমি বুঝতে পারছ না। এমনি কাজই তো আমি আশা করছিলাম তোমার মতো মেয়ের কাছ থেকে। সেদিন তুমি রবীন্দ্রনাথের একটি গানের যে ব্যাখ্যা আমায় শুনিয়েছিলে আজও আমি তা ভুলতে পারিনি। হ্যাঁ, যে কথাটা আমি জানতে চেয়েছিলাম, দেওকীপ্রসাদের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা আদায়ের প্রতিশ্রুতি তুমি কী করে আদায় করলে সেটা সত্যি একটা জানার মতো ব্যাপার বটে!—এভাবে আবার সেই পুরোণো প্রসংগ তোলেন সামন্ত।

হ্যাঁ, আমারও বলতে গিয়ে সে কথাটাই বলা হয়নি। ইতিমধ্যে মাও মারা গেলেন। আর আমিও দেখলাম আমার পূর্ণ মুক্তির সময় আসন্ন। একদিন সুযোগ বুঝে আমি বলেই ফেললাম দেওকীপ্রসাদজীকে যে, আমায়

দেখবার জন্যে তাঁর যে তৃষ্ণা সে তৃষ্ণা মেটাতে হলে তার উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে তাঁকে।

মুখের ওপর বলতে পারলে তাঁকে এমনি কথা?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন উকীলবাবু। তার উত্তরে কী বল্লেন দেওকীপ্রসাদজী, তাও জানতে চান তিনি।

কতো মূল্য দিতে হবে, সে প্রশ্ন দেওকীপ্রসাদ জিগ্যেস করলেন আমাকে। উচ্চ শিক্ষা লাভে ব্যর্থ হয়ে জীবনে আমি যে ব্যথা পেয়েছি এবং সে অবস্থার প্রতিকারের জন্যে আমি যে পরিকল্পনা করেছি তার সব কথাই আমি তখন খুলে বলি তাঁকে। তিনিও আমায় পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দেন সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু শুধু আশ্বাসের ওপর নির্ভর করলে ঠকতে হতে পারে সাবিত্রী।—সানন্ত তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন এই বলে।

শুধু আশ্বাসের ওপর আমি নির্ভর করে নেই উকীলবাবু! দলিলপত্র সব তৈরি। আসছে বুধবার বিদ্যাভবনের উদ্বোধন সভাতেই দেওকীপ্রসাদজী তাঁর পাঁচ লক্ষ টাকা দানের কথা ঘোষণা করবেন। তিনিই তো আমাদের বিদ্যাভবন পরিচালক সভার সভাপতি।

এবার তাহলে দেখছি, দেওকীপ্রসাদের একটু নাম যশের দিকেও লোভ গিয়েছে।

তা কতোটা ঠিক জানিনে। তবে আমায় না দেখে নাকি তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব। বেঁচে থাকার জন্যে মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা দর্শনী, ওঁর কাছে তা আর এমন কী বেশি, বলুন!

মোটেই নয়! মোটেই নয়! এমন একটা বড়ো কাজে হাত দিয়েছ, যতো প্রয়োজন আর যতো পারো আদায়

করে নাও দেওকীপ্রসাদের কাছ থেকে। অন্তত কিছু টাকা তাঁর সৎ কাজে ব্যয় হোক!—সামন্ত শুভেচ্ছা জানায় এই বলে।

সাবিত্রীও তার প্রণামের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার প্রার্থনা জানিয়ে বিদায় নেয় উকীলবাবুর বৈঠকখানা থেকে।

অজ্ঞাতবাস

স্বর্ণকার বেণী দত্ত অবস্থাপন্ন না হলেও অভাবে পড়ে নি কোনদিন।

সোনারূপোর দোকান বেণীর বাড়ির সঙ্গেই। বাপ- ঠাকুর্দা যেমন ঘরে বসে বসে ব্যবসা চালিয়ে গেছেন, বেণী দত্তরও ঠিক তেমনি ভাবেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ থোক টাকার লোভটাই সব কিছু বানচাল করে দিলে।

নতুন রাস্তা বার করা হবে শহরে।

প্রশস্ত রাজপথের ছক কাটা হয়েছে। বেণী দত্তর দোকানঘরও পড়ে যায় সেই প্রস্তাবিত রাস্তার ওপর।

যথাসময়ে উচ্ছেদের নোটিশ আসে। অবশ্য তার সঙ্গে ক্ষতিপূরণেরও আশ্বাস থাকে।

স্ত্রী যশোদার সঙ্গে ঘন ঘন পরামর্শ করে বেণী। এক সঙ্গে চার হাজার টাকা পাওয়া গেলে অন্তত বঁড়ো একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

মেয়েটা ডাগর হয়েছে। ওকে নিয়ে মহা দুশ্চিন্তা বাপ-মায়ের।

ছেলেছোকরাদের যে নজর পড়েছে সুমতির ওপর কদিনই যশোদা বলেছে সে কথা বেণীকে। এ অবস্থায় মেয়েটাকে যতো শীগ্‌গির পরের ঘরে তুলে দেওয়া যায় ততোই ভালো।

সমস্যা হলো একটি স্বর্ণকার সুপাত্র খুঁজে বার করা। টাকা হাতে থাকলে সুপাত্র পাওয়াও খুব কঠিন হবে না।

এইভাবে চিন্তা করে স্বামী-স্ত্রী ঠিক করে ফেলে যে,

চার হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ নিয়ে দোকানঘর ও বসতঘর দুই-ই তারা ছেড়ে দেবে।

দোকানঘর ছাড়তেই হবে। তার জন্যে ধার্য করা হয়েছে দেড় হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ। আর বসতঘর ছাড়লে আরো আড়াই হাজার টাকা বেশি পাওয়া যাবে, তবে সেটা ছাড়া না ছাড়া বেণী দত্তর ইচ্ছাধীন। কারণ রাস্তার প্রয়োজনে শুধুমাত্র 'যশোদা জুয়েলারি' দোকানটা তুলে দিলেই চলে, দোকানের পিছনের বসত বাড়ি ভাঙার দরকার করে না। তবে দোকানের মালিকের যদি তাতে সুবিধা হয়, তা হলে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট তাতে রাজি বলেই বেণী দত্তকে দুরকমের প্রস্তাবই দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু দেড়হাজার টাকায় কি হবে? আগে কোথাও যেয়ে একটা দোকানঘর এবং তার সঙ্গে মাথা গোঁজবার মতো একটা ডেরা বাঁধতে হবে তো! তারপর মেয়ের বিয়ে। কাজেই অন্ততপক্ষে চার হাজার টাকাই চাই।

এইভাবে নানা দিক বিচার বিবেচনা করে বেণী দত্ত তার দোকানঘর আর পৈতৃক বাড়ি দুই-ই ছেড়ে দেয় চার হাজার টাকার বিনিময়ে।

বর্ধমান জেলার পাঁশকুড়া গ্রাম। যশোদার বাপের বাড়ি সে গ্রামে। কোলকাতা ছেড়ে বেণী সপরিবারে পাঁশকুড়ায় যেয়েই প্রথমে ওঠে। কিন্তু সেখানে বেশিদিন থাকা দত্তর মোটেই ইচ্ছে নয়। তার আত্মসম্মানে বাধে শ্বশুরবাড়িতে বেশীদিন থাকতে।

অবশ্য বেণীর শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই উঠেপড়ে লেগে যায় পাঁশকুড়ায় বেণীর বাড়িঘর তৈরি করার ব্যাপারে। তাদের উদ্যোগেই গ্রাম্য জমিদারের কাছ থেকে নামমাত্র

খাজনায় সামান্য বাসের জমি ও বিঘা দশেক ধানী জমির ব্যবস্থা হয়ে যায় বেণীর জন্যে।

দু খানা ঘরের ছোট্ট বাড়ি ছাড়াও বাজারে একখানা দোকানঘরও তুলে নেয় বেণী দত্ত। তা না হলে চলবেই বা কেন? বসে বসে খেলে চার হাজার টাকা তো হাওয়ার মতো উড়ে যাবে।

পাঁশকুড়ায় এসেও দিন মোটামুটি একরকম কেটে যায়। তবে দোকান থেকে তেমন কোন আয় না হওয়ায় ঘরের টাকা ভেঙেই সংসারের অনেক খরচ চালাতে হয়।

নিজেদের জমির ধানে বছরে কোনরকমে ছ মাসের ব্যবস্থা হয়ে যায় বটে, কিন্তু বাকি ছ মাসের খোরাকি? আর সব জিনিষপত্তরও তো বাজার থেকে না কিনলে চলে না।

এভাবে হাতের টাকা ক্রমশই নিঃশেষ হয়ে আসে আর বেণী দত্তর হা-হুতাশও বেড়েই চলে।

তামাপিতলের বাসনওয়ালা বাড়ির পিছনের রাস্তা দিয়ে বাসন বাজিয়ে বাজিয়ে হেঁকে যায়—'থালা, বাটি, গ্লাস চাই—ঘটি কলসী, ডেক্‌চি চাই!'

হঠাৎ যশোদার সখ যায় একটা বাটি কিনতে। সে ডেকে আনে বাসনওয়ালাকে। দরদস্তুর করে। এক টাকা ছ আনায় একটি সুন্দর বাটি পছন্দও করে ফেলে।

ওগো শুনছো, তোমার জন্যে একটা বাটি কিনেছি।

বাটি? আমার জন্যে বাটি! কেন কী হলো হঠাৎ?—গৃহিণীর কথায় যেন চমকে ওঠে বেণী দত্ত।

পুরুষ মানুষকে খাবারের পাতে কি আর সব জিনিষ দেওয়া যায়? তাতে খুবই অসুবিধে হয় খেতে। তাই একটা মাছের ঝোলের বাটি কিনলাম। দাম তো মাত্র এক টাকা ছ আনা। দাওনা দামটা, বাসনওয়ালাকে চুকিয়ে দিয়ে আসি।

কী বল্লে, মাছের ঝোলের বাটি কিনেছ আমার জন্যে! এই বুড়ো বয়সে আমাকে খুশি করবার জন্যে অদ্ভুত সখ তো দেখছি তোমার!

সখের আবার কী দেখলে এতে?

আইবুড়ো মেয়েটা ঘরের মধ্যে ঢেঙা হয়ে উঠলো চোখের সামনে, আর তুমি বাসনপত্র কিনছো, এ সখ নয় তো কী? লজ্জা করে না তোমার কথা বলতে?—বেণী দত্তর ধমক খেয়ে যশোদা থতমত খেয়ে যায় প্রথমটায়, কিন্তু পরক্ষণেই গর্জে ওঠে—

লজ্জা কিসের, মেয়ে ডাগর হয়েছে সে কি আমার দোষ, না তোমার? পাত্তর খুঁজে বার করবে তুমি, না সেও আমাকেই করতে হবে? আজ প্রায় তিন চার বছর হয়ে গেল পাঁশকুড়ায় এসেছ, বসে বসে তামাক টানা আর কেত্তন করা ছাড়া আর কোন্ কাজটা করছো, শুনি!

খুব হয়েছে। থামো এখন। যা ইচ্ছে করো গে, যাও। বেণীর চড়া সুর নেমে আসে গিন্নীর কড়া কথায়।

যশোদা কিন্তু থামে না তবু। বরং সপ্তমে উঠে যায় তার পর।

থামবো কেন থামবো? একটা দোকানঘর তুলে রেখেছো বাজারে। সেটাকে লোক-দেখানো ব্যাপার ছাড়া আর কীইবা বলা যায়? মাসে ক'টা পয়সা এসেছে তোমার দোকান থেকে? এখন মেয়ে বড়ো হয়েছে বলে দোষ হলো আমার, লজ্জা হবে আমার, তাই না?—বাঘিনীর মতো চোখ দুটোকে বড়ো বড়ো করে হাত নেড়ে নেড়ে এতোগুলো ঝাঁজালো কথা বেণী দত্তকে শুনিয়ে দিয়ে বাটিটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় যশোদা। বাসনওয়ালাকে মিষ্টি কথায় বাটিটা ফেরৎ দিয়ে ঘরে এসেই শুয়ে পড়ে আর রাগে গজরাতে থাকে।

ইদানীং বেণী দত্তর সঙ্গে যশোদার এমনি ধরণের কথা কাটাকাটি প্রায়ই লেগে আছে।

বুড়ো বয়সে একটা ছেলে হওয়ায় যশোদা আরো বিপাকে পড়েছে। কোন ঝগড়া-ঝাটির সুরুতেই এ কথাটা সে শুনিয়ে দেয় বেণীকে। এই শিশুটার দায়িত্ব ঘাড়ে না পড়লে সে নাকি দু চোখ যেদিকে যায় সেদিকেই চলে যেতো।

এসব কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে বেণীর। বেণী তাই এখন আর বেশি সময় বাড়িতে থাকে না। দোকানেই কাটায় দিনের বারো আনা। ছেলে রতনকেও আজকাল দোকানে নিয়ে যায়। তার বয়স এখন প্রায় বছর আটেক।

সুমতির বিয়ের জন্যে এবার বেশ উঠেপড়েই লেগে যায় বেণী। সে আশা করেছিল, মামারাই উদ্যোগী হয়ে মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থাদি করে দেবে। তারা এ-গাঁয়ের পুরোনো লোক, তাদের সমাজ রয়েছে আশপাশের গাঁয়ে, সকলেই তাদের জানাশুনো। কাজেই সে রকম আশা করা বেণীর পক্ষে অস্বাভাবিকও কিছু নয়।

মেয়ের বিয়ের জন্যে তাড়াহুড়ো করার কারণও আছে। হাতের টাকা পয়সা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এ কয় বছরে। এখনো হাজারখানেক টাকা সম্বল আছে। তারও কিছু বেশিই আছে হয়তো। এ টাকাগুলো থাকতে থাকতেই মেয়েটাকে কারুর হাতে গছিয়ে দিতে না পারলে আর উপায় নেই।

ভাগ্যি নেহাৎই ভালো মেয়েটার! আকস্মিকভাবেই একটা ছেলের খোঁজ পেয়ে যায় বেণী।

গুসকরা বাজারের পুরোনো দোকানদার দীনবন্ধু দাসও জাতিতে সোনার বেণে। তার বড়ো ছেলে একটা পাশ

দিয়ে কোলকাতায় নামকরা কোন একটা সওদাগরি অফিসে চাকরি করে।

কথায় কথায় দীনবন্ধুর মুখ থেকেই একদিন প্রকাশ পায় এই খবর। তাই শুনে বেণীই তার মেয়ের সঙ্গে দীনবন্ধুর ছেলের সম্বন্ধের প্রস্তাব করে বসে।

মেয়েটি সুন্দরী হলে এ প্রস্তাবে তার আপত্তি নেই কোন, এ কথা জানায় দীনবন্ধু।

মেয়ে দেখার পর্ব শেষ হয়ে যায় নির্দিষ্ট দিনে। সম্বন্ধও একরকম স্থির হয়ে যায় উভয় পক্ষের সম্মতিতে। কিন্তু দেনাপাওনার বিষয় নিয়ে একটু গোলমাল দেখা দেয়। তবে বেণীর ধরাধরিতে শেষ পর্যন্ত কাজে বাধা হয় না কোন।

দীনবন্ধুর ছেলে সুরথের সঙ্গে সুমতির বিয়ে হয়ে যায়। বেণী দত্তকে কেবল এই কথা দিতে হয় যে, পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যেই এক এক করে চুক্তির সকল সর্তই সে পালন করবে।

কথায়ই বলে, হাজার কথা না পুরলে বিয়ে হয় না। বেণী তা হাড়ে হাড়েই বুঝে নিয়েছে মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে। মেয়ের বাপ বলে প্রায় সব কথাই সে মেনে নিয়েছে। অনেক সময় সাধ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েও অনেক ব্যাপারে রাজি হয়েছে। ছেলেটা বড়ো হয়ে উঠছে, ভগবান নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন, এই ভরসা।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আরেক। সুমতির বিয়ের পর ক্রমান্বয়ে দুবছর ধরে দামোদরের সে কী বন্যা! বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে সে বন্যা যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে তাতে চুক্তি পূরণ করা তো দূরের কথা, বেণীর মতো লোকের পক্ষে প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকাই দায়।

দু খানার মধ্যে একখানা ঘর বেণী প্রথম বন্যার বছরেই বিক্রি করে দিয়েছে। সেই টাকা আর দোকানের সামান্য আয় দিয়ে আরো একটা বছর কোন রকমে কেটে যায়। কিন্তু এবার আর সংসার চালাবার কোন পথই খুঁজে পায় না বেণী।

দীনবন্ধুর মুদী দোকান। নিত্যকার প্রয়োজনীয় জিনিষ মজুত থাকে তার দোকানে। তার দোকানে কেনাবেচা চলেই, সেখানে খদ্দেরেব অভাব হয় না।

কিন্তু আকালের দিনে মানুষ পেটের চিন্তা করবে, না গহনার কথা ভাববে?

গত কয়েক বছরের চেষ্টায় বেণী দু চারজন ভারি রকমের খদ্দেরের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিয়েছিল। কিন্তু তারা এখন আর ভুলেও তার গহনার দোকানের চৌকাঠ পর্যন্ত মাড়ায় না। এ অবস্থায় আর বাজারে ঘর রেখে খাজনার দায় বাড়িয়েই বা কী লাভ?

বেণী তাই দোকানঘরখানাও ছেড়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে।

এ দিকে হঠাৎ এমন আর এক কাণ্ড ঘটে বসে যার ফলে দোকান নিয়ে মাথা ঘামানো বেণীর পক্ষে আর সম্ভবই হয় না।

বেণীর দশ বছরের ছেলে রতন আজ প্রায় একমাস ধরে নিখোঁজ। বিকেল বেলা আর সব ছেলেদের সঙ্গে সেই যে খেলতে গেল আর ফিরেই এলো না সেই রতন।

খবরের কাগজে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দিয়েও কোনই ফল হলো না। থানা-পুলিশ কিছুই বাকি রাখেনি বেণী। জমিদার বাড়ির সেজ খোকাবাবুকে ধরে কোলকাতায় বেতারেও রতনের নিরুদ্দেশের খবরটা প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু সবই নিষ্ফল। কোথাও কোন হদিসই পাওয়া গেল না ছেলেটার।

এর পরে সংসারের ওপর আর কোন আসক্তি থাকতে পারে কোন বাপ-মায়ের? শেষ পর্যন্ত তাই দোকান ঘরটাও বিক্রি করে দেয় বেণী।

বেণীর এতো বিপদের মধ্যেও দীনবন্ধু কিন্তু তার ছেলের বিয়ের সময়কার চুক্তির কথা মোটেই ভোলে না। গত তিন বছরের মধ্যে কম করে হলেও অন্তত তিনশবার সে নানা কথাপ্রসংগে চুক্তিমতো সমস্ত দেনা চুকিয়ে দিতে বলেছে বেণীকে। কিন্তু বেঁচে থাকাটাই যেখানে সমস্যা সেখানে দেনা শোধ করার দাবী যে অনর্থক তা দীনবন্ধুর অজানা নয়। তবু জেনেশুনেই যেন সে বৈবাহিককে ছুটো কথা শুনিয়ে আনন্দ পায়।

শুধু এই নয়, তার বাবার অক্ষমতার জন্যে সুমতিকেও কম গঞ্জনা সহ্য করতে হয় না শ্বশুরবাড়িতে। সে সব কথাও ঘুরে ফিরে বেণীর কাছে এসে পৌঁছয়। বেণী আর যশোদা মনমরা হয়ে শুধু দুঃখ করে সেসব শুনে।

হ্যাঁগো একটা কথা শুনেছ, সেদিন নন্দর পিসি গিয়েছিল ওপাড়ায় বেড়াতে। সুমতিকেও সে দেখতে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে দেখেই সুমতি নাকি কেঁদে ফেলেছে।

কেন কী হয়েছে তার?—যশোদার কথা শেষ না হতেই প্রশ্ন করে বেণী।

কী আর হবে? খুব ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছ মেয়েকে, তার ফল। সুমতি আসতে চেয়েছিল কয়েকদিনের জন্যে আমাদের দেখতে। তার জন্যে তাকে শুধু শ্বশুরের গালমন্দই শুনতে হয়নি, শাশুড়ির হাতের মারধরও খেতে হয়েছে। তাদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত নাকি সুমতিকে এমনি অত্যাচার সহ্য করতেই হবে।
—যশোদার দু চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে এই বলতে বলতে।

বেণী ভেবেই পায় না কী করবে। তবে পথে পথে ভিক্ষে করতে হলেও সে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে যে, দীনবন্ধুর দেনা মিটিয়ে দিয়ে সে তার মেয়েটাকে গঞ্জনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে কিনা। তার পাপের, তার অক্ষমতার জের ভুগতে হবে তার নিরীহ মেয়েকে, এ কী করে সহ্য করবে সে!

রাতারাতি স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে স্থির করে ফেলে, এগাঁয়ে আর থাকবে না তারা।

পাঁশকুড়ায় মানুষ নেই। যাদের ওপর বেণী খুব বেশি ভরসা করেছিল, বিপদের দিনে তার সেই শ্বশুরবাড়ির লোকদের কাছ থেকেও সে তেমন কোন সহানুভূতি পায়নি। কাজেই তার ভুল ভেঙেছে।

নিঃস্বের সম্বল কোলকাতা। সেখানে গেলে আর কিছু না হোক তারা দু জনে দু মুঠো ভাত খেয়ে বাঁচতে পারবেই।

এই আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে পর দিনই ঘুম থেকে উঠে অতি গোপনে বেণী তার বসতঘর সহ সমস্ত জমি-জমা বিক্রি করে দেয় তার পাশের গাঁয়ের এক লোকের কাছে। বাজারের দোকান ঘরখানাও সে-ই কিনেছিল বেণীর কাছ থেকে।

বেণী বাড়ি ও জমি বিক্রির টাকা নিয়ে সেদিনই দীনবন্ধুর বাড়িতে যেয়ে সমস্ত দেনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিয়ে আসে। আসার সময় দীনবন্ধু আর তার স্ত্রীকে শুধু বলে আসে, তার মেয়েটা যেন একটু শান্তিতে থাকতে পারে, এটুকুই তাদের কাছে তার প্রার্থনা।

সুমতির সঙ্গে দেখা করে বেণী শুধু তাকে মনে মনে আশীর্বাদই করেছে, মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারেনি।

টাকা পেয়ে দীনবন্ধু আনন্দিত হয়েছে যেমনি, আশ্চর্যও হয়েছে ঠিক ততোখানি।

কী ব্যাপার, কোথায় পেলো বেণী একসঙ্গে এতো টাকা, এমনি নানা প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে দীনবন্ধুর মনে। বেণীকে তাই আদর আপ্যায়নেরও সে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু বেণী এ বাড়িতে আর জলগ্রহণও করবে না, এই তার প্রতিজ্ঞা। কাজেই সে তার কাজ শেষ করেই চলে যায়। কোথায় যায় কেউ তার খোঁজ রাখে না।

পরদিনই বেণী আর যশোদা চলে আসে কোলকাতায়।

পূর্ব বাঙ্‌লার উদ্বাস্তুদের মতোই তারাও হাওড়া ষ্টেশনে আশ্রয় নেয়। মতলব, কয়েকদিন থাকবে সেখানে। কোথায়ইবা আর যাবে হঠাৎ করে? কিন্তু মতলব যাই থাক, মন ঘুরে বেড়ায় তাদের মহানগরীর মর্মকেন্দ্রে।

কোলকাতায় বংশ পরম্পরায় যেখানে বাস করেছে সে জায়গাটা একবার দেখে আসতে ইচ্ছে হয় বেণীর। হাওড়া ষ্টেশনে একরাত কাটিয়ে আর স্থির থকেতে পারে না সে। ভোর হতেই তাদের সামান্য জিনিষপত্র পূর্ব বাঙলার একটি উদ্বাস্তু পরিবার-এর উপর দেখা-শুনোর ভার দিয়ে যশোদাকে নিয়ে চিত্তরঞ্জন এভেন্যুতে এসে উপস্থিত হয় বেণী। পিতৃপুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত জায়গাটা খুঁজে খুঁজে বার করে সে।

একটা নতুন রাস্তা বেরিয়ে গেছে বেণীর পৈতৃক দোকানের চিহ্ন বিলীন করে দিয়ে। যে আড়াই কাঠা জমির ওপর তাদের চালাঘর ছিল, সেখানেও আজ বিরাট চারতলা দালান।

বেণী খবর নিয়ে জানে কোলকাতার এই নতুন অঞ্চলটায় এখন প্রতি কাঠা জমির দর দশ হাজার টাকা।

বেণীর ঘর ছেড়ে যাবার তো কোন বাধ্যবাধকতাই ছিল না। তারা এখানকার ঘর ছেড়ে দিয়েছিল এক থোকে কিছু

টাকা পাবার লোভে। কিন্তু মাটি কামড়ে এখানে পড়ে থাকলে তাদের কি আজ এমনি করে পথে দাঁড়াতে হতো!

এ কোলকাতার মাটিরই মানুষ বেণী আর তার স্ত্রী যশোদা, অথচ এখানে কেউ আজ আর তাদের চেনে না, তাদের কাছেও সবাই অচেনা। সব নতুন নতুন মুখ। অধিকাংশই অবাঙালী।

কোলকাতার মানুষেরই আজ কোলকাতায় অজ্ঞাতবাস!

বিরাট চারতলা দালানের দিকে চেয়ে থাকে বেণী আর যশোদা। তাদের চোখের জল রোধ করতে পারে না তারা।

চোখের জল তো নয়, দুঃখের ঢেউ। ঢেউ-এর পর ঢেউ এসে অভিভূত করে ফেলে বেণীদের। অন্তরের আগুনকে নেভাতে পারে না সে জল। তা যদি পারতো!

এর পরে আরো অনেকদিন সস্ত্রীক বেণীকে ঐ বিরাট বাড়িটার সামনে মিছিমিছি ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। সময় সময় নির্বাকভাবে তারা তাকিয়ে রয়েছে বাড়িটার দিকে।

শহরের কোথায় কোন্ অজ্ঞাত বস্তিতে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে ওরা কে জানে?

রিলিফ

এরা কি মানুষ, না মানুষের ছায়া ?

সেই ভোর থেকে সুরু হয় এদের মিছিল। শরণার্থীদের মিছিল। সরকারী দাক্ষিণ্যের ছিটেফোঁটা যদি বা পাওয়া যায়। যদিই বা বেঁচে থাকবার কোন একটা সুযোগ করে দেন সরকার। সে আশায় মানুষগুলো রোজ ভিড় করে। ভিক্ষার্থীর বেশে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এখানে, এই অকল্যাণ্ড হাউসের দরজায়।

দেখে দেখে অনেকগুলো মুখ চেনা হয়ে গেছে পরেশ ডাক্তারের।

রিলিফকর্মী পরেশ ডাক্তার। গত কয় বছর ধরে বিচিত্র ধরণের ও বিচিত্র মনের নানা মানুষের আনাগোনা তিনি লক্ষ্য করছেন এখানে।

দিনের পর দিন আশাভংগের বেদনা নিয়ে কতো নারী, কতো বালক-বৃদ্ধ ফিরে গেছে এখান থেকে, হয়তো কোন শিবিরে কিংবা ফুটপাথে, নয়তো গাছের তলায় বেছে নেওয়া কোন নির্দিষ্ট আশ্রয়ে। আবার ভোর হতে না হতেই নতুন আশায় বুক বেঁধে লাইন দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তারা এইখানে অকল্যাণ্ড হাউসের দোরগোড়ায়।

সরকারী ভবনের কৃপণ অন্তঃপুর থেকে বড়ো সহজে কোন দাক্ষিণ্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে না এই দুর্গত কৃপার্থীদের ওপর। অনেক দিন এ কথা ভেবেছেন পরেশ ডাক্তার।

হৃতৈশ্বর্য রিলিফ ভবন এই অকল্যাণ্ড হাউসের মতোই এখানকার প্রার্থী মানুষগুলোও আজ বিগতশ্রী।

বাড়িটা নিজেই যেন ভাগ্যবিপর্যয়ের স্বাক্ষর বহন করছে।

নিছকই একটা নাচঘর ছিল বাড়িটা। লোহা ও কাঠের তৈরি হলেও একটা স্পর্ধার প্রকাশ ছিল তার আত্মপরিচয়ে। শোনা যায় রাত্রির প্রতি পদক্ষেপে শহরের ঐ এলাকার হাওয়াটাও নাকি ক্রমশই ভারি হয়ে উঠতো। নাম-কৌলীন্যে আজো বাড়িটা ঠিক তেমনি আছে। গায়ের লাল রংটাও নতুন করে লাগানো হয় বছর বছর। সামনের সেই ছোট্ট ফুল বাগিচাটারও তদারক চলছে আগেরই মতো, আর সেই বাগানের শান্ত ও ভদ্র পরিবেশের মধ্যেই শাসনের রুদ্র রূপেরও পরিচয় বর্তমান। রক্তচক্ষুর দৃষ্টি বিস্তার করে আজো পড়ে রয়েছে পুরোনো কালের দুটো কামান। কিন্তু তবুও কোথায় যেন তার আভিজাত্যে চিড় ধরেছে।

তাই আজ আভিজাত্যহীন মানুষের মিছিলে অকল্যাণ্ড হাউস বিমুখ বিমর্ষতায় শুধু দাঁড়িয়েই থাকে। সহজে কাউকে কৃপা করতে চায় না।

একা একা ভাবছিলেন পরেশ ডাক্তার। ভাবতে ভাবতে গিয়ে ঢুকলেন সেই রিলিফ ভবনে। প্রায় রোজই আসতে হয় তাঁকে এখানে। সাধ্যমতো সাহায্যও করেন তিনি উদ্বাস্তুদের সরকারী দাক্ষিণ্য লাভে।

এসেই আজ চোখে পড়লো একজন প্রৌঢ়া মহিলাকে। চোখে মুখে তাঁর বিষণ্ণতার ছাপ। কিন্তু এককালে যে তাঁরও আভিজাত্য ছিল অর্থে ও সম্মানে, তার সবটুকু চিহ্ন এখনো মিলিয়ে যায়নি সেই সকরুণ দৃষ্টি থেকে।

আগেও আরো দু তিন দিন চোখে পড়েছে এই মহিলাকে।

পরিচিতা বলেই মনে হয়েছে বার বার। কিন্তু কোন সূত্রেরই সন্ধান করতে পারেননি ডাক্তার কোথায় কি ভাবে তাঁদের মধ্যে এই পরিচয় ঘটেছিল।

প্রৌঢ়ার দিকে এগিয়ে যায় ডাক্তারের মন। সংকোচ বাধ দেয় প্রথমটায়। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে।

পরিচয়ের কোন প্রমাণ নাই-বা পাওয়া যায় যদি, কী-ই বা এমন ক্ষতি তাতে?

আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে এসেছেন বলুন তো! কার্ড পেয়েছেন কোন?—প্রৌঢ়ার সামনে যেয়ে জিগ্যেস করেন পরেশ ডাক্তার।

একান্ত আন্তরিক ও সহানুভূতিপূর্ণ এই প্রশ্নে বাঁচার আশা যেন খুঁজে পান মহিলা। সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করছেন অসহায় উদ্বাস্তুদের জন্যে এ কথা তিনিও শুনেছেন। কিন্তু তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যা ও শিশুপুত্রকে নিয়ে তিনিও যে সরকারী সাহায্যের অধিকারী এ প্রমাণ তিনি কি করে যে করবেন, কয়দিন ধরে তাই ছিল তাঁর একমাত্র ভাবনা। এবার হয়তো তার একটা সুরাহা হবে, এমনি একটা আশা জাগে তাঁর মনে। আবার আশংকাও হয়। যে ব্যবহার তিনি পেয়ে আসছেন এতোদিন ধরে, আবার যে তাই হবে না কে জানে?

ঢাকা থেকে এসেছি আমি আমার মেয়ে আর এই ছেলেটিকে নিয়ে।

প্রৌঢ়ার কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে ওঠেন ডাক্তার।

ঢাকায় থাকতেন আপনি?

হ্যাঁ।—মুখ তুলে উত্তর দেন মহিলা।

আর্মানিটোলার পরেশ ডাক্তারকে চেনেন?

নিশ্চয়ই চিনি, আমরাও তো আর্মানিটোলাতেই ছিলাম প্রায় আট বছর।

ডাক্তারের মনে আর সংশয় থাকে না কোন। পরিচয়ের সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন তিনি এতোক্ষণে। পুরোনো দিনের স্মৃতির ভিড় যেন তাঁকে ঘিরে ধরে।

তুমি নন্দা না? এখানে কেন তুমি?—গলার স্বর ভারি হয়ে উঠে ডাক্তারের, আর কোন কথাই বলতে পারেন না তিনি।

পাশেই দাঁড়ানো ছোট ছেলে অমল একবার তার মা এবং আর একবার অপরিচিত আগন্তুকের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায়। অমলের চোখে চোখ পড়ে ডাক্তারের। ছেলেটাকে জোর করে কোলে তুলে নিয়ে আদর করেন তিনি।

মহিলা ভালো করে লক্ষ্য করেন ডাক্তারকে। হ্যাঁ, এই তো তিনি! তাঁকেই তো আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাঁর।

পরেশবাবু, এতোদিন কী করে ভুলে আছেন আমাদের? —এই বলতে বলতে অশ্রুসজল হয়ে ওঠে প্রৌঢ়ার দুটি চোখ।

নন্দা, বিশ্বাস করো, তোমার শান্তির জন্যেই তোমাকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করছি আমি। কিন্তু তুমি এখানে এমনি বেশে এসে দাঁড়াবে তাতো আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। কী হয়েছে তোমার?

কিছুই না।—ঝর্ ঝর্ করে চোখের জল ঝরে পড়ে নন্দার। আধ ময়লা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে মুখ ঘুরিয়ে নেন তিনি। অভিমানের কালোছায়া তাঁকে গ্রাস করে ফেলে।

একটু ভেবে, একটু ভয়ে ভয়েই যেন আবার জিগ্যেস করেন ডাক্তার, বল না কি হয়েছে তোমার, সুধাংশু কোথায়?

সে সব বলে আর কী লাভ হবে আমার পরেশবাবু? কতো লোককে তো বলেছি, কিন্তু গঞ্জনা অপমান ছাড়া কারুর

কাছ থেকেই তো কিছু পাইনি। তাই নতুন করে আমার কথা কাউকে শোনাতে ভরসা হয় না আর।

আমাকেও তুমি তাদেরই মতো একজন বলে ধরে নিয়েছ, নন্দা? তাতে তোমার দোষ নেই কোন। মানুষেরই ব্যবহার তোমার মনকে বিষিয়ে তুলেছে। কিন্তু আমি যে তাদেরই মতো নই তা প্রমাণের কোন সুযোগ তো দিলে না আমায়!

শুনবেন তা হলে, পরেশবাবু! বেশ বলছি সব কথা।

এখানে নয়, চলো গংগার ঘাটে গিয়ে বসা যাক।

এই বলে পরেশ ডাক্তার এগিয়ে চলেন নদীর দিকে। নন্দা দেবী অনুসরণ করেন তাঁর খোকাকে নিয়ে। অনেকগুলো দৃষ্টি যেন চিলের মত ছোঁ মারে তাঁদের ওপর একই সঙ্গে।

বেলা পড়ে আসছে। অফিসগুলো সব ছুটি হবার মুখে। এ অফিস সে অফিস থেকে দু একজন করে লোকজনও বেরিয়ে পড়ছে।

সারাদিনের কাজের পর প্রায় অবসন্ন এক আধবুড়ো কেরাণী পান চিবুতে চিবুতে একটু ত্রস্ত পদেই এগিয়ে চলছিলেন হাইকোর্ট ট্রাম ডিপোর দিকে। সঙ্গে তাঁর আর একজন লোক। হয়তো তাঁরই এক তরুণ সহকর্মী। কৌটো খুলে আর একটা পান নিজের মুখে পুরে দিয়ে ভদ্রলোক তাঁর সংগীকে জিগ্যেস করছিলেন, কি হে, চাই নাকি একটা।

ঠিক সেই সময়ই পরেশ ডাক্তার আর নন্দাকে তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দেখে বুড়ো কেরাণী বেচারা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন পিছন ফিরে। নন্দা দেবীই যে তাঁর লক্ষ্য তা না বল্লেও চলে। পুরোনো রোগ কি সহজে সারে?

আহা! ট্রামটা মিস্ করে ফেললেন যে! এর পরের ট্রামে উঠতে কি হাংগামা হবে, বুঝবেন এখন।

এতো ভাবনা কিসের হে ছোকরা? ছেলে মানুষ স্ফূর্তি করে চলে যাবে। ভিড়ের জন্যে আমার চিন্তা নেই কিছু।

সংগী যুবক বৃদ্ধের সঙ্গে একটু রসিকতাই করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি বেশ সরলভাবেই কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

নদীর পাড় ধরে খানিকটা বেড়িয়ে চাঁদপাল ঘাটে গিয়ে বসেন পরেশবাবুরা। ঢাকার বাদামতলীঘাট-সদরঘাটের কথা মনে পড়ে নন্দার। চানাচুরওয়ালা পাশ দিয়ে ডেকে যায়। পরেশবাবু জিগ্যেস করেন তাকে, চীনেবাদাম আছে?

আছে বাবু।

দাও চার পয়সার। নন্দাও খাবে নাকি? নেবো আরো?

না, আমার ভালো লাগে না চীনেবাদাম।—নন্দা হাত জোড় করে মার্জনা চায়।

পাঁচ বছর আগে টাইফয়েড অসুখ থেকে উঠে নন্দা দেবী এই পরেশ বাবুরই সঙ্গে প্রায়ই বেড়াতে যেতেন ঢাকার বাদামতলী ঘাটে। খুকুকে নিয়ে বুড়িগংগার তীরে করোনেশন পার্কের সামনে বাঁধানো ঘাটের টুলের উপর বসে কতো গল্প করেছেন তাঁরা। আজ গংগার এই ঘাটে বসে অতীতের সে সব কথা মনে পড়ে।

খুকুর বয়স তখন এগারো কি বারো, আজ সে সতেরো। আজকে পরেশবাবু খোকনকে চীনেবাদাম কিনে দিলেন আদর করে। তখন দিতেন খুকুকে।

নদীর পাড়ে বসে এসব ভাবতে ভাবতে অনেকটা যেন শান্তি পান নন্দা।

কি, বলছ না যে কিছু?—জিগ্যেস করেন ডাক্তার।

কী যে বলবো ভেবেই পাচ্ছি না। অথচ কতো যে কথা আমার বলার! হ্যাঁ, আপনার বন্ধুর কথা জিগ্যেস করছিলেন।

পাঁচ বছর ধরে তাঁর কোন খবরই তো আমি রাখি না, তিনিও আমাদের কোন খোঁজ করেননি আর।—বলতে বলতে আবার ছল্ ছল্ হয়ে আসে তাঁর চোখ।

আঃ, সুধাংশুর মতো brilliant ছেলে কি হয়ে গেল! Unchecked মদের নেশা মানুষের কী সর্বনাশই না করে! —দুঃখ করেন ডাক্তার।

আপনি তো জানেন পরেশবাবু তাঁকে সংশোধন করার জন্যে কতো লাঞ্ছনা সহ্য করেছি আমি। আপনিও অনেক চেষ্টা করেছেন। সে ঋণ শোধ করতে পারবো না কোন দিন।

সে সব কথা এখন থাক, নন্দা। তোমরা কোথায় আছ আর চলছেই বা কি করে, তাই বলো।

এখন যে কোথায় আছি তা বলা খুব কঠিন। পিসতুত দাদাকে আমার দুঃখের কাহিনী সব খুলে লিখলে তিনিই আমায় নিয়ে আসেন ঢাকা থেকে বছর পাঁচেক আগে।

সেখানেই আছ সেই থেকে, না অন্য কোথাও চলে গেছ?

না, সেখানেই আছি? তবে প্রথম যখন আসি তখন দাদার সংসারও ছিল ছোট, পিসিমাও ছিলেন বেঁচে—কোন অসুবিধেই হয়নি। কিন্তু পিসিমার মৃত্যুর পর থেকে বৌদির কর্তৃত্বে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দাদারও জীবন হয়ে উঠেছে অতিষ্ঠ।

কেন, এর কারণ?—নন্দার কথায় যেন চমকে ওঠেন ডাক্তার।

এই তো স্বাভাবিক পরেশ বাবু।

তাই।—ডাক্তার কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যান এই শুনে।

পিসতুত ভাই-এর বৌ এতো দিন ধরে যে আমাদের ঝামেলা সহ্য করেছেন তাই তো যথেষ্ট। তাছাড়া চার-পাঁচটি ছেলে-পুলের ঘর, তার ওপর আমরা তিনটি প্রাণী—দাদার আয়ে কুলিয়ে ওঠাও কষ্ট।

সে অবশ্য ভিন্ন কথা।—এবার অবস্থাটা অনেকখানি বুঝে নেন ডাক্তার।

তাই সবদিক বিবেচনা করে মাস দুই আগে আমিই একদিন গিয়ে বললাম দাদাকে,—দাদা, আমাদের জন্যে আর কতো কষ্ট করবে তোমরা? খুকুকে নিয়েই যতো ভাবনা। তা না হলে কোন বড়লোকের বাড়িতে ঝি বা রাঁধুনির কাজ করেও হয়তো দুটো পেট চালানো যেতো। যাই হোক, আমাদের জন্যে তুমি আর ভেবো না। যে করেই হোক, দুমুঠো ভাত আমি সংগ্রহ করবো। শুধু আশ্রয়টুকু চাই তোমার বাড়িতে।

তাতে কি বল্লেন তিনি?—জানতে চাইলেন পরেশ বাবু।

সেদিন আমার এতোগুলো কথার কোন জবাবই দেননি দাদা। মুখ ফুটে কথা বলার মতো অবস্থাও ছিল না তাঁর। আমার কথায় তাঁর যে কতো দুঃখ হয়েছে তা আমিও বুঝেছিলাম। কিন্তু আমার তো দাদাকে সে কথা বলা ছাড়া কোন উপায় ছিল না আর।

তারপর কী হলো তাই বলো।–শেষ অবধি জানার জন্যে অধীর হয়ে ওঠেন ডাক্তার।

সেই থেকে দাদার বাড়িতেই আর একটা উনুন বসেছে আমাদের জন্যে।—মুখ নীচু করে নন্দা বলে।

চল্‌ছে কী করে?

খুবই গোপনে একটা ঠিকে ঝির কাজ করছি দু মাস ধরে। দাদাও কিছু কিছু সাহায্য করছেন বৌদিকে না জানিয়ে। তাতেই কোন রকমে চলে যাচ্ছে আমাদের।

হায় ভগবান, সুধাংশুর স্ত্রীর এই অবস্থা!—অন্তর কেঁপে ওঠে পরেশ বাবুর।

কিন্তু ঝিয়ের কাজটা হয়তো আর বেশিদিন গোপন রাখা

সম্ভব হবে না পরেশ বাবু! মেয়েটার যদি কোন একটা গতি হয়ে যেতো এর মাঝে, তা হলে কোন চিন্তাই থাকতো না আমার। আজ একদিকে তার ভাবনা, আর একদিকে দাদার মান-সম্মানের প্রশ্ন। যদি কোন রকমে জানাজানি হয়ে যায় আমার কাজের কথা, তাহলে দাদার আর মুখ থাকবে না, মেয়েটারও বিয়ে দেওয়া মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

আচ্ছা দাঁড়াও, খুকুর বিয়ের ব্যাপারটা কতোদূর কি করা যায় আমিই দেখছি। দেখা যাক, সরকারী সাহায্য কিছু পাওয়া যায় কি না। জানা-শোনার মধ্যে একটি ভালো ছেলেই খুঁজে পাওয়া যাবে আশা করছি। অমন টুকটুকে মেয়ের বরের জন্যে আবার ভাবনা!

মেয়ে আর আমার টুকটুকে নেই, পরেশবাবু! সেই কবে দেখেছেন আপনি। তারপর যে কী চেহারা হয়ে গেছে ওর, কল্পনাও করতে পারবেন না। হবে না? ফাঁক পেলেই বাবার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। ওর বাবার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না খুকু। দিনের মধ্যে কতোবার প্রশ্ন করবে, ঢাকায় কতো কষ্ট হচ্ছে ওর বাবার,' এইসব গোলমালের দিনে কতো ভয়ই না জানি লাগছে তাঁর, আরো কতো কি? কিন্তু তিনি তো ভাবছেন না তাঁর খুকুর কথা একটি বারও!

তা বলো না নন্দা। খুকুর কথা না ভেবেই পারে না সুধাংশু। পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কেই তাকে উদাসীন দেখেছি। ভুলেও তাকে বড়ো একটা কারুর নামোচ্চারণ করতে পর্যন্ত শুনিনি। কিন্তু কথায় কথায় খুকুর প্রসংগ আলোচনায় স্নেহ মমতায় ভরা তার কোমল প্রাণের পরিচয় বার বার ধরা পড়েছে।

ঠিকই বলেছেন পরেশবাবু, এক সময় সে রকমই ছিল। কিন্তু আজ তা অতীত কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু তুমি যাই বলো নন্দা, আজো সে নিশ্চয়ই তোমাদের কাউকেই ভোলেনি, আমি এ কথা জোর করেই বলতে পারি। তবে নেশায় মানুষকে আর মানুষ রাখে না, জান তো? যেদিন শেষ বিদায় নিয়ে এলাম তোমাদের আর্মানিটোলার বাড়ি থেকে সেদিনের ঘটনা মনে আছে তোমার?

মনে নেই আবার! সেদিন থেকেই তো আমার ওপর চরম নির্যাতন সুরু। সেই লাঞ্ছনা অবমাননা সহ্য করেও আরো বছর দুই কাটিয়েছি সেখানে। আর পারিনি।

তার পরেই কোলকাতা চলে এলে বুঝি?

হ্যাঁ, অবস্থা চরমে উঠলে দাদাকে লিখে জানাই সব কথা। দেশভাগ হয়ে গেছে তখন। মাতলামি আপনার বন্ধুর আরো গেছে বেড়ে। কোনদিন বাড়ি ফেরেন, কোনদিন ফেরেন না। আর বাড়ি এসেই সুরু করেন তাণ্ডবলীলা।

আজে বাজে সব চিন্তা করতে করতে মাথাটাই বিগড়ে গিয়েছিল সুধাংশুর। আশ্চর্য! পুরুষমানুষ কেন এতো sentimental হবে তা ভেবেই পান না ডাক্তার। অতীত স্মৃতি ঢেউ তোলে তাঁর মনে।

নিরুপায় হয়ে তখন চিঠি লিখলে দাদাকে, তাই না?— প্রশ্ন করে পরেশবাবু।

হ্যাঁ, এমনি অবস্থায়ই আমার চিঠি পেয়ে একদিন দাদা হঠাৎ এসে উপস্থিত আমাদের বাড়িতে। কতোরকম করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তিনি আপনার বন্ধুকে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। একরাত্রি ছিলেন দাদা আমাদের সঙ্গে, তারই মধ্যে আমার দুর্বিষহ জীবনের পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন!

যাক্ সে সব পুরোনো কথা। খুকুর বিয়েটা হয়ে গেলেই অনেকটা দায়মুক্ত হবে তুমি। সরকারী সাহায্যটা পাওয়া

সম্ভব হবে না পরেশ বাবু! মেয়েটার যদি কোন একটা গতি হয়ে যেতো এর মাঝে, তা হলে কোন চিন্তাই থাকতো না আমার। আজ একদিকে তার ভাবনা, আর একদিকে দাদার মান-সম্মানের প্রশ্ন। যদি কোন রকমে জানাজানি হয়ে যায় আমার কাজের কথা, তাহলে দাদার আর মুখ থাকবে না, মেয়েটারও বিয়ে দেওয়া মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

আচ্ছা দাঁড়াও, খুকুর বিয়ের ব্যাপারটা কতোদূর কি করা যায় আমিই দেখছি। দেখা যাক, সরকারী সাহায্য কিছু পাওয়া যায় কি না। জানা-শোনার মধ্যে একটি ভালো ছেলেই খুঁজে পাওয়া যাবে আশা করছি। অমন টুকটুকে মেয়ের বরের জন্যে আবার ভাবনা!

মেয়ে আর আমার টুকটুকে নেই, পরেশবাবু! সেই কবে দেখেছেন আপনি। তারপর যে কী চেহারা হয়ে গেছে ওর, কল্পনাও করতে পারবেন না। হবে না? ফাঁক পেলেই বাবার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। ওর বাবার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না খুকু। দিনের মধ্যে কতোবার প্রশ্ন করবে, ঢাকায় কতো কষ্ট হচ্ছে ওর বাবার,' এইসব গোলমালের দিনে কতো ভয়ই না জানি লাগছে তাঁর, আরো কতো কি? কিন্তু তিনি তো ভাবছেন না তাঁর খুকুর কথা একটি বারও!

তা বলো না নন্দা। খুকুর কথা না ভেবেই পারে না সুধাংশু। পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কেই তাকে উদাসীন দেখেছি। ভুলেও তাকে বড়ো একটা কারুর নামোচ্চারণ করতে পর্যন্ত শুনিনি। কিন্তু কথায় কথায় খুকুর প্রসংগ আলোচনায় স্নেহ মমতায় ভরা তার কোমল প্রাণের পরিচয় বার বার ধরা পড়েছে।

ঠিকই বলেছেন পরেশবাবু, এক সময় সে রকমই ছিল। কিন্তু আজ তা অতীত কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু তুমি যাই বলো নন্দা, আজো সে নিশ্চয়ই তোমাদের কাউকেই ভোলেনি, আমি এ কথা জোর করেই বলতে পারি। তবে নেশায় মানুষকে আর মানুষ রাখে না, জান তো? যেদিন শেষ বিদায় নিয়ে এলাম তোমাদের আর্মানিটোলার বাড়ি থেকে সেদিনের ঘটনা মনে আছে তোমার?

মনে নেই আবার! সেদিন থেকেই তো আমার ওপর চরম নির্যাতন সুরু। সেই লাঞ্ছনা অবমাননা সহ্য করেও আরো বছর দুই কাটিয়েছি সেখানে। আর পারিনি।

তার পরেই কোলকাতা চলে এলে বুঝি?

হ্যাঁ, অবস্থা চরমে উঠলে দাদাকে লিখে জানাই সব কথা। দেশভাগ হয়ে গেছে তখন। মাতলামি আপনার বন্ধুর আরো গেছে বেড়ে। কোনদিন বাড়ি ফেরেন, কোনদিন ফেরেন না। আর বাড়ি এসেই সুরু করেন তাণ্ডবলীলা।

আজে বাজে সব চিন্তা করতে করতে মাথাটাই বিগড়ে গিয়েছিল সুধাংশুর। আশ্চর্য! পুরুষমানুষ কেন এতো sentimental হবে তা ভেবেই পান না ডাক্তার। অতীত স্মৃতি ঢেউ তোলে তাঁর মনে।

নিরুপায় হয়ে তখন চিঠি লিখলে দাদাকে, তাই না?—প্রশ্ন করে পরেশবাবু।

হ্যাঁ, এমনি অবস্থায়ই আমার চিঠি পেয়ে একদিন দাদা হঠাৎ এসে উপস্থিত আমাদের বাড়িতে। কতোরকম করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তিনি আপনার বন্ধুকে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। একরাত্রি ছিলেন দাদা আমাদের সঙ্গে, তারই মধ্যে আমার দুর্বিষহ জীবনের পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন!

যাক্ সে সব পুরোনো কথা। খুকুর বিয়েটা হয়ে গেলেই অনেকটা দায়মুক্ত হবে তুমি। সরকারী সাহায্যটা পাওয়া

যাবে বলেই আমি আশা করি। আমি জানি, অনেকে এ রকম সাহায্য পেয়েছেন।

তাঁরা তো আর আমার মতো হতভাগিনী নন। খুঁটির জোর না থাকলে সে সব পাওয়া কঠিন, পাওয়ার চেষ্টা করাও বোকামি। আমি হয়রান হয়ে গেছি পরেশবাবু, আপনার আর সে চেষ্টায় দরকার নেই।

কেন, কী হয়েছে?

কি হয়েছে! শুনলে অবাক হয়ে যাবেন আপনি। খুকুর সম্বন্ধ একটা মোটামুটি স্থির করেই সাহায্যের দরখাস্ত করেছিলাম আমি। যে বাড়িতে কাজ করি সে বাড়ির বাবুর কথায় একটু ভরসা পেয়েই দরখাস্ত করেছিলাম।

কি হলো তাতে?

কী আর হবে? আমার কে আছে যে বড়ো বড়ো অফিসারদের আমার হয়ে যেয়ে ধরাধরি করবে বা যাদের নাম করলে কর্তাদের করুণা দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে?

কিন্তু আমি যাদের কথা জানি, তাদের তো এতো বেগ পেতে হয়নি মেয়ে বিয়ের সাহায্য মঞ্জুর করাতে! তোমার বেলা এমনি হবার কী কারণ তাতো বুঝতে পারছি না।

দশ-বারো দিন ধরে সে যে কী হয়রানি তা আর কি বলবো! দরখাস্তটির ওপর সইয়ের যে কী ঝড় বয়ে গেছে তা না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না কেউ।—নন্দা তাঁর আঁচল থেকে খুলে দরখাস্তখানা হাতে দেন পরেশবাবুর।

সমস্তব্য মোট তেরটি স্বাক্ষর যেন ভ্রুকুটিকুটিল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আবেদনকারিণীর দিকে। আবেদন যে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হয়েছে তাও নয়। তবে যে অপমানকর সর্ত রয়েছে সাহায্য মঞ্জুরের সঙ্গে তাতে যে-কোন ভদ্র সন্তানের পক্ষে সে দান

ধন্যবাদের (?) সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া গত্যন্তর থাকতে পারে না।

এমনি কড়ার করে কেউ বিয়ে করে এতো শুনিনি বাবা!—দরখাস্তখানা উল্টে পাল্টে পরেশ ডাক্তারও সরকারী বুদ্ধি বিবেচনা: বিস্মিত হন এবং ব্যথিতও।

যাক্, এ পঁচিশ টাকার খয়রাতির জন্যে আর মাথা না খুঁড়ে ভালোই করেছ নন্দা। আমি কথা দিচ্ছি, সে সম্বন্ধ যদি তোমার হাতছাড়া হয়ে গিয়েও থাকে তা হলে আমি এমন এক ছেলের সঙ্গে খুকুর বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবো, যেখানে তোমার একটি কাণাকড়িও খরচ করতে হবে না! সেজন্যে ভেবো না তুমি। কিন্তু ফের কেন তুমি এসেছ এই অকল্যাণ্ড হাউসে, তাই শুনি।

আবার এসেছি কেন? আগেই বলেছি, আমি যে পালিয়ে অন্য একটা বাসায় কাজ করছি সেটা হয়তো আর বেশিদিন অজানা থাকবে না। জানাজানি হয়ে গেলে দাদার বাসায়ও আমার আর স্থান হবে না। তখন আমি কি করবো? খুকুর বিয়ের ব্যাপারে সাহায্যের তদ্বিরে এসে দেখতে পেয়েছি যে, অনেকের ভাগ্যে ফ্রি রেশনের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। সে আশা নিয়েই আজ এসেছিলাম।

ফ্রি রেশনের কথা বল্‌ছ? তা পাওয়া তো খুব সহজ নয়, নন্দা! সে তো রীতিমতো কঠিন ব্যাপার।

তা হলে!—সচকিত হয়ে ওঠেন নন্দাদেবী। বুকটা দুর্ দুর্ করে ওঠে তাঁর।

নবাগত উদ্বাস্তুদের জন্যে কিছু দিনের ব্যবস্থা করা হয় বটে, কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর আহারের স্থায়ী সংস্থান করা কোন সরকারের পক্ষেই কি সম্ভব? সরকারের দিকটাও তো ভেবে দেখা দরকার।

এ কী কথা বলছেন আপনি, পরেশ বাবু! উদ্বাস্তুরা ভাববে সরকারের কথা! উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব সরকারের নয়, তাই বলতে চান আপনি?—নন্দাদেবীর প্রশ্নে [illegible] অগ্নিঝলক।

না, তা মোটেই নয়। আমি শুধু বলছিলাম, উদ্বাস্তু সমস্যায় সরকারও যে কিরূপ বিব্রত তা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তবে একেবারে যাদের কেউ নেই, এমন অসহায়া নারী ও শিশুর ভার অবশ্যই সরকার গ্রহণ করে থাকেন এবং নিশ্চয়ই তা করা উচিত।—নন্দা দেবীর রোষ থেকে এই বলে কোন রকমে আত্মরক্ষা করেন ডাক্তার।

সে হিসেবেও কি আমি সরকারের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতে পারি না?

তোমার স্বামী বর্তমান। তাই তোমার আবেদন বিবেচিত হবে বলে আমার তো মনে হয় না।

পরেশবাবুর কথায় চমকে উঠেন নন্দাদেবী। মুখে আর কথা ফোটে না তাঁর। নির্বাক নিস্তব্ধ পরিবেশ। খোকনের চীনেবাদামের ঠোঙাটাও নিঃশেষ হয়ে এসেছে এতোক্ষণে।

•

এরই মধ্যে হঠাৎ একখানা নৌকো থেকে কান্নার সুর ভেসে আসে। নৌকোখানা যতোই এগিয়ে আসে মায়ের স্নেহার্ত ক্রন্দনধ্বনিও ততোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কর্তা কইতে পারেন, শ্মশান ঘাটটা কদ্দূর?—মাঝি কাঁদতে কাঁদতে প্রশ্ন করে ডাক্তারকে।

বিক্রমপুরের জলামাটির ভাষা ডাক্তারের অন্তরকে গভীর-ভাবে স্পর্শ করে, নন্দাদেবীকেও। তাঁদেরও জন্ম যে বিক্রমপুরের মাটিতেই।

কী হয়েছে তোমার?—ডাক্তার প্রশ্ন করেন মাঝিকে।

কী আর কমু কর্তা ? জীবন বাঁচানের আশায় বাড়ি-ঘর, দুই-তিনখান নাও সব কিছু ফালাইয়া পালাইয়া আইছিলাম এই আশে। পারলাম না কর্তা ! বাঁচাইতে পারলাম না ! আট বছরের ছাইলাটা দশ-বারো দিনের নিমোনিতে মারা পড়লো !—এই কয়টি কথা বলতে বলতে মাঝি একেবারেই যেন ভেঙে পড়ে। হাতের বৈঠা ফেলে গামছায় চোখ চেপে কাঁদতে থাকে সে।

ক্রমে ঘাটে এসে নৌকা লাগে। পশ্চিম আকাশে রক্তিমাভা। সন্ধ্যা নেমেছে। এদিক ওদিক দু-চারটে তারার ছায়া চিক্ চিক্ করে ওঠে গংগার বুকে।

তুমি এখন বাড়ি ফিরবে নন্দা ? মাঝিকে এখানে একটু অপেক্ষা করতে বলে আমি বরং তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি, কি বল ?

না, তার কিছু দরকার নেই, পরেশবাবু। আমার তো এ পথ চেনাই হয়ে গেছে। শেয়ালদার ট্রামে উঠে সোজা চলে যাব একেবারে। কিন্তু এ বেচারাদের অবস্থা দেখে কেমন লাগছে যেন। ঢাকার দিকেই বাড়ি বলে মনে হচ্ছে না ওদের ?

বাড়ি কোথায় তোমাদের, মাঝি ?—নন্দাদেবীর আগ্রহ পূরণে ডাক্তার জিগ্যেস করেন মাঝিকে।

বিক্রমপুর তালতলা বাজারের কাছাকাছি বাড়ি আছিল আমাগো, কর্তাবাবু ! বেশ সুখে শান্তিতে আছিলাম বাবু।

চলে এলে কেন এই অজানা অচেনা দেশে ?

কী আর করুম কর্তা ? ছিয়ান্ন সালের মাঘ-ফাল্গুনে ঢাকায় যখন মাইর চলছে তখন পয়সাওলা বাবুরা যে যতো আগে পারছে ততো আগেই পালাইয়া পার পাইছে। আমরা গরীব-গরবারা পড়ছি বিপাকে। বর্ষায় খালে-বিলে জল আইলে

কাতারে কাতারে সব লোক নৌকায় আইতে সুরু করছে এই আশে। মাইনষে শ্মশানে থাকতে পারে কদ্দিন, আপনিই কন?

এখানে এসেই বা কি সুবিধে হলো তোমাদের?

না বাবু, এইখানে আইয়া আর সোয়াস্তি কই? আগে ধলেশ্বরী-বুড়িগংগায় জাল বাইয়া যেমন ধরছি মাছ, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ শহরে হেই মাছ বিক্রি কইরা তেমনই পাইছি পয়সা। এই কইলকাতা শহরেই কি কম মাছ চালান পাঠাইছি বাবু! আর আইজ আমার কি অবস্থা! মাছ ধরা নৌকায় ছই লাগাইয়া কোন রকমে মাথা গোজবার ঠাঁই কইরা লইছিলাম তিনটা মাইনষের। একটা মাত্র ছাইলা, তারেও বাঁচাইতে পারলাম না। এক ফোঁটা ওষুধও দিতে পারলাম না তার মুখে। যা কিছু সম্বল আছিল খাইয়াই সব শেষ কইরা ফালাইছি। অখন উপায়? আইচ্ছা কর্তা, শহরে দাহ করতে নাকি টাকা নেয় শ্মশানে?

হ্যাঁ, লাগেইতো কিছু টাকা। আচ্ছা, ভয় নেই তোমার। আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

শ্মশানখোলা কদ্দূর বাবু?—দুই চোখ দিয়ে দর্ দর্ করে তখনও জল পড়ছে মাঝির।

দাঁড়াও।

মাঝির সকরুণ বর্ণনায় যেমনি পরেশবাবু বিচলিত, তেমনি নন্দাদেবী। কিন্তু কারুর পক্ষেই দেরি করার উপায় নেই আর।

তোমার তো যাবার পয়সা লাগবে কিছু, নন্দা!

না, ছটা পয়সা এখনও আছে আমার হাতে। তাতেই হয়ে যাবে।

একটু ম্লান হাসি হাসেন ডাক্তার। মনিব্যাগটা খুলে একটা এক টাকার নোট বের করে দেন নন্দাকে, আর তাঁদের ঠিকানাটা টুকে নেন এক টুকরো কাগজে।

মা, বড্ড খিদে পেয়েছে।—চার বছরের ছেলে জড়িয়ে ধরে নন্দাকে।

পাবে না খিদে? সেই কোন্ সকালে কী চারটে খেয়ে বেরিয়েছে, আর এখন সন্ধ্যে! চীনেবাদাম কটি পেয়ে বেশ চুপ করেই ছিল এতোক্ষণ। কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না অমল।

নন্দাদেবী অমলকে কোলে তুলে নিয়ে বিদায় নমস্কার জানান ডাক্তারকে। পরেশবাবুও প্রতিনমস্কার জানান, আর ছেলেটাকে আদর করেন একটু।

নিতান্ত ব্যথা-করুণ হলেও পরেশ ডাক্তার যেন কেমন একটা শিহরণ অনুভব করেন নন্দার সঙ্গে এই আলাপে।

বুকপকেট থেকে সেই টুকরো কাগজটা তুলে ডাক্তার লাইট পোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে আর একবার বেশ ভাল করে পড়ে নেন নন্দার নাম আর তাঁর কোলকাতার ঠিকানাটা।

অন্ধকারে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসে। তবু ডাক্তার গ্যাস লাইটের আলোর দূরবীণে আর একবার দেখে নেবার চেষ্টা করেন নন্দাকে। শেষে মাঝির নৌকোয় গিয়ে ওঠেন।

কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েছেন ডাক্তার।

নৌকোর ভেতরে মরা ছেলেটার বুকের ওপর পড়ে তখনো কাঁদছে মাঝি-বৌ। ডাক্তার চুপ-চাপ বসেই আছেন গলুইয়ের ওপর। দু রকমের চিন্তায় করুণ হয়ে উঠেছে তাঁর মন। নৌকোর মতো তাঁর মনও দুলছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

নন্দাদেবী ততোক্ষণে ট্রামে চেপে অনেক দূর চলে গেছেন, হয়তো আধাপথ। কিংবা তারও বেশি।

বাবু, কোন্ দিক যামু? শ্মশান কদ্দূর এইখান থিগা?

মাঝির শুকনো গলার কঠোর প্রশ্নে সচকিত হয়ে ওঠেন ডাক্তার।

উত্তরে চলো। বেশ খানিকটা যেতে হবে নৌকো বেয়ে।

উত্তরমুখো নৌকো চলে। ক্ষীণ কণ্ঠের চাপা কান্নার সুর ফেলে আসা পিছনের হাওয়ার সংগে ভেসে যায়।

পরেশ ডাক্তারের কানেও সে স্বরের রেশ বাজে। কিন্তু তিনি শুনেও যেন শুনতে পান না কিছু।

মাঝিও দু একটা কথা বলতে গিয়ে চুপ করে যায় কোন সদুত্তর না পেয়ে।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে অবারিত গংগাবক্ষে পরেশ ডাক্তারের মন যেন তাঁর সমগ্র অতীতের ইতিহাসখানা খুলে ধরেছে তাঁর সামনে। তিনি সেই ইতিহাস পর্যালোচনায় নিমগ্ন। আর কোনদিকেই কোন রকম খেয়াল নেই তাঁর।

জমিদারের ছেলে সুধাংশু রায় পরেশকে কী ভালোই না বাসতেন! তাঁরই টাকায় মিটফোর্ড স্কুলে পড়ার সাধ পূরণ হয়েছে তাঁর, একথা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় পরেশ ডাক্তারের পক্ষে।

জমিদারী থেকে তিনশো করে টাকা আসতো সুধাংশুর নামে। তার থেকে মাসে একশো করে বাঁধা ছিল পরেশের জন্যে।

ডাক্তার হয়ে জনসেবার ব্রত গ্রহণ করার সাধু সংকল্পের জন্যে পরেশ মুখোপাধ্যায়কে একজন আদর্শ পুরুষরূপে দাঁড় করাবার একটা ঝোঁক চেপে গিয়েছিল সুধাংশু রায়ের। আপন ভবিষ্যতের জন্যে পরেশের নিজের যতোটা না ভাবনা ছিল তার চেয়ে ঢের বেশি ছিল সুধাংশু রায়ের। মিটফোর্ডে পড়ার সময় কোনদিন কোন অভাব বা অসুবিধায় পড়তে হয়নি পরেশকে তাঁর বন্ধুর সতর্ক দৃষ্টির জন্যেই।

ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়েই জনসেবায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন পরেশবাবু। সংসারের কোন বন্ধনই নেই তাঁর। নতুন করে সংসার গড়ারও কোন ইচ্ছে বা কল্পনা নেই।

রায় কলকাতায় ল' পড়তে চলে গেলে তাঁদেরই আর্মানি-টোলার বাড়িতে থেকে পরেশ ডাক্তার প্রথম সুরু করলেন তাঁর প্র্যাকটিস্।

প্র্যাকটিস্ তো নামে মাত্র। প্রায় সবটাই বিনে পয়সার কারবার। তা হলেও তিনচার বছরের মধ্যেই তাঁর নামডাক বেশ ছড়িয়ে পড়ে। শহরময় মুখে মুখে তাঁর কথা। অনেক চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরই ঈর্ষ্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাঁর আকস্মিক জনপ্রিয়তা।

এদিকে আইন পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বড়ো একটা ষ্টেটের ম্যানেজারী জুটে যায় সুধাংশু রায়ের। ঢাকাতেই তাঁর অফিস। সোনায় সোহাগা আর কি! নিজেদের বাড়িতে থেকে অফিস করা। তার ওপর একেবারে ছোটবেলাকার পরিচিত মহল। সেই বুড়িগংগা, বাদামতলীর ঘাট, করোনেশন পার্ক, পরেশ ডাক্তার ইত্যাদি।

পরেশের নামডাকের কথা শুনে সুধাংশুর আনন্দের সীমা নেই। সবই ভালো, কিন্তু তবু রায়ের মনে একটা আশংকা, যদি টের পেয়ে যায় সবাই তাঁর ব্যাপার!

পরেশকে অবশ্যি সবই খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেম তিনি গোড়াতেই। অনেক সংশোধনের চেষ্টাও হয়েছিল পরেশের দিক থেকে। কিন্তু কিছুই ফল হয়নি তাতে। নেশার অভ্যাস বেড়েই চলেছে, যেমন হয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে রায়ের বিধবা মাও মারা গেলেন। ডাক্তারও বছর না কাটতেই নতুন আস্তানা পেতেছেন। নতুন ডিসপেন্সারী খুলেছেন তিনি আর্মানিটোলা স্কোয়ারের একপাশে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও তাঁর সেখানেই। তবে রায়ের বাড়িতে আসা-যাওয়া বাঁধা আছে দু বেলাই।

আরো কিছুদিন পরের কথা।

কোলকাতার কলেজ-জীবনের এক বন্ধুর বোন নন্দা আসেন সুধাংশুর সংসার-লক্ষ্মী হয়ে।

স্বাচ্ছন্দ্যবিলাসে নন্দার দিনগুলো বেশ আনন্দেই কাটে প্রথম প্রথম। কিন্তু সংসারের প্রধান যিনি সর্ব বিষয়ে তাঁর উদাসীনতা ক্রমশই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রায় যে নেশা করেন তা বুঝে নিতেও বেশি দেরি হয়নি নন্দার। সে বদ অভ্যাস থেকে স্বামীকে মুক্ত করার জন্যে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ চাপও বড়ো কম দেননি তিনি। কিন্তু তাতেও কোন ফলই হয়নি। বরং আগে যা চলতো আড়ালে, খুকুর জন্মের পর থেকে সেই লুকোচুরির বাঁধও যেন ভেঙে গেল। প্রকাশ্যেই সুরু হলো মাতলামি।

এই সমস্ত ঘটনাই সিনেমার ছবির মতো এক এক করে আবার যেন নতুন করে এসে দাঁড়ায় পরেশ ডাক্তারের মুখোমুখি।

সুধাংশু রায়ের উদারতা ও বন্ধুপ্রীতির কথা যতোই মনে হয়, সবিস্ময় কৃতজ্ঞতায় ততোই ডাক্তারের অন্তর ভরে ওঠে। কিন্তু এতো বছরের মধ্যেও তাঁর প্রতি রায়ের শেষ দিনের সেই অপমানকর ব্যবহারের কোন সংগত কারণ খুঁজে পান না তিনি।

মনে পড়ে, পরম আত্মীয়ের মতো কতো পরিচর্যায় ও চিকিৎসায় ডাক্তার গুরুতর টাইফয়েড রোগ থেকে নিরাময় করে তুলেছিলেন নন্দাকে।

নন্দাকে হয়তো বাঁচানোই যাবে না, এমন আশংকাও পরেশবাবু কয়েকবার প্রকাশ করেছিলেন তাঁর বন্ধুর কাছে।

সুধাংশু রায় প্রতিবারই বলেছেন, ভাই আমার তো কিছুই করার নেই এ ব্যাপারে, টাকা পয়সা যা দরকার তার জন্যে কিছুই ভাবতে হবে না, কিন্তু যা কিছু করণীয় তার সবই করতে হবে তোমাকেই। হয়েছেও ঠিক তাই।

স্বামীর ঔদাসীন্যকে নির্মমতা বলেই ধরে নিয়েছেন নন্দাদেবী। দুঃখ করে অনেক সময় মৃত্যু কামনাও করেছেন তিনি। আবার পরক্ষণেই বলেছেন, আমি মলে খুকুর কি অবস্থা হবে?

নন্দাদেবী সেরে ওঠেন বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর একেবারেই ভেঙে যায়।

ডাক্তার প্রস্তাব করেন রায়ের কাছে, নন্দাকে নিয়ে বাইরে কোন ভালো জায়গায় কিছুদিনের জন্যে ঘুরে আসতে।

কিন্তু সে দায়িত্বও রায় নিঃসংকোচেই চাপিয়ে দিতে চান ডাক্তারের ওপর।

ও সব ভাই আমার দ্বারা হবে না। ঘোরাঘুরি আমার মোটেই ভালো লাগে না। তা ছাড়া একদিনের জন্যেও ঢাকা ছেড়ে যেতে মন চায় না আমার। দরকার মনে কর তো তুমিই ভাই নন্দাকে নিয়ে কিছুদিন ঘুরে এসো না পশ্চিম থেকে!—রায়ের এই কথাগুলো আজো অনুরণিত হয় পরেশ ডাক্তারের কানে।

এমনি অগাধ বিশ্বাস যাঁর বন্ধু সম্পর্কে, কী করে যে তিনি তাঁর সঙ্গে সেদিন অমন ব্যবহার করলেন, তার রহস্য উদ্ধার করা সত্যই দুষ্কর।

মাতলামি বলে ব্যাপারটাকে হয়তো উড়িয়ে দেওয়া চলতো। সেভাবে মনকে বোঝাবার চেষ্টাও করেছেন ডাক্তার। কিন্তু মাতলামি তো রায়ের নতুন নয়। কোনদিন আভাসে ইঙ্গিতেও যা প্রকাশ পায়নি, সেদিন চূড়ান্ত মাতলামির মুহূর্তে রায়ের দু একটি কথার মধ্যেই ধরা পড়েছে সন্দেহের শেকড় তাঁর মনের গভীরে কতোদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

তাই তারপর থেকে পরেশ ডাক্তার তাঁর আজীবন অন্তরঙ্গ সুহৃদের সঙ্গে আর যোগাযোগ রক্ষা করা সঙ্গত মনে করেন নি।

সেদিনের সেই ঘটনা যেমনি আকস্মিক তেমনি অভাবনীয়। তাছাড়া নিতান্তই সংক্ষিপ্ত।

দৃষ্টিকটু বোধে ডাক্তারের অসম্মতির জন্যেই হোক অথবা নন্দার অনিচ্ছা বা অভিমানের জন্যেই হোক চেঞ্জে যাবার প্রসংগটা চাপা পড়ে যায়। বুড়িগংগার হাওয়া খেয়েই রায়-গিন্নীর স্বাস্থ্যোদ্ধারের ব্যবস্থা পাকা হয়। সে ব্যবস্থাও রূপায়িত করার ভার পড়ে ডাক্তারেরই ওপরে।

সেদিন ছিল খুকুর জন্মদিন।

মায়ের শারীরিক অসুস্থতার জন্যে সমারোহ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখলেও খুকুর একসেট নতুন পোষাক কেনার কথা ঠিক হয়ে আছে আগে থেকেই। কিন্তু আগের দিন বেরুতে না পারায় সময়মতো পোষাক আনা আর সম্ভব হয়নি। তাই মনটা ভালো লাগছিল না নন্দার। যাই হোক, জন্মদিনের বিকেল বেলাতেই নতুন নতুন জিনিষপত্র পেয়ে খুকুর মন ভরে ওঠে খুশিতে। খুকুর মায়েরও।

পরেশ ডাক্তারের উদ্যোগেই এসেছে এসব পোষাক পরিচ্ছদ।

নতুন পোষাকে ভারি মানিয়েছে কিন্তু খুকুকে। মেয়েকে নিজের হাতে মনের মতো করে সাজিয়েছে নন্দা। কাজল-লতার রেখায় আলো ঠিক্‌রে পড়ছে খুকুর কালো হরিণ চোখ থেকে। নন্দা চেয়ে চেয়ে দেখেন আর মেয়ের রূপের গর্বে ভেঙে খান্ খান হয়ে যান্ মনে মনে।

খুকুকে নিয়ে সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরোন নন্দাদেবী। রোজ-কার মতো সেদিনও পরেশ ডাক্তারই সংগী।

বাদামতলীর ঘাটে অনেকক্ষণ ধরে বেড়ান তাঁরা। সুধাংশু সঙ্গে থাকলে বিশেষ করে সেদিনের সন্ধ্যায় নন্দার আনন্দ যে অনেক বেশি হতো, পরেশ ডাক্তারেরও তা মনে হয়েছিল।

বাড়িতে ফিরতে একটু বেশি রাতই হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

তা হলেও একটু মিষ্টি মুখ না করিয়ে কিছুতেই সেই শুভদিনে ডাক্তারকে ছাড়তে পারেন না নন্দাদেবী। আর এই মিষ্টিমুখ করার ব্যাপার নিয়েই যতো গোলমাল।

রায়ের শোবার ঘরে ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন ডাক্তার। খানিক বাদেই চা আর এক প্লেট খাবার নিয়ে আসেন নন্দাদেবী।

উরে বাপ্‌স্, কে খাবে এতো খাবার?—বলেই চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন পরেশবাবু।

প্লেটটার ওপর মুহূর্ত খানেক দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে,—এ ছুটো মিষ্টি খুকুর জন্যে, আর এটা নাও তুমি—এই বলে পরেশবাবু বাঁ হাতে নন্দার এক হাত ধরে রেখে তাঁর মুখে পুরে দিতে যান একটি সন্দেশ।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সেই ঘরে সুধাংশু রায়ের নাটকীয় প্রবেশ।

ওয়াণ্ডারফুল!.....স্কাউন্‌ড্রেল!!—এই সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করে খুকুর জন্মদিন উপলক্ষে কেনা হাতের 'ডল'টা সজোরে ছুঁড়ে মারেন রায় বন্ধুকে লক্ষ্য করে।

লক্ষ্য ঠিক ছিল না, তাই রক্ষা। ডাক্তার অক্ষতভাবেই দূরে সরে গিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। নিজের মধ্যে আর নিজে নেই সুধাংশু, বেশ বুঝতে পারেন ডাক্তার। তাই বন্ধুর তিরস্কারে কোন গুরুত্ব না দিয়ে তা উড়িয়েই দিতে চান তিনি।

সুধাংশুর পা ছু খানা যেন আর চলতে পারছিল না। তাঁর সমগ্র দেহ-পিণ্ড টলতে টলতে এগিয়ে আসছিল পরেশবাবুর দিকে। আবার পরক্ষণেই তাঁর পা ছুটোকে যেন পিছন দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কোন্ এক অদৃশ্য যাছুকর। পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো অস্থিরতায় টলমল করছিল একটা গোটা

মানুষ। ভীষণ একটা উত্তেজনার ভাব, কিন্তু কথা ফুটছিল না সুধাংশুর মুখে। নেশায় আড়ষ্ট তাঁর জিহ্বা।

বন্ধুর এই অবস্থা দেখে দুঃখ হয় পরেশবাবুর। একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি নিজেই হাত ধরে নিয়ে আসেন রায়কে, শুইয়ে দেন ফরাস-ঢাকা তক্তপোষে তাকিয়ার ওপর।

একটু নড়বারও শক্তি নেই রায়ের, তবু তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে আসে,—স্কাউন্‌ড্রেল!

ভুল বুঝো না, ভাই!

ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে নির্জীব মাতাল রায়বাবু যেন আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বড়ো বড়ো চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলেন, গেট আউট!

প্রায় দুর্বোধ্য সে কথা। তবু আর সহ্য করতে পারেন না পরেশবাবু, অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে।

নন্দা, যাই।—সুধাংশু রায়ের আর্মানিটোলার বাড়ি থেকে শেষবারের মতো বিদায় নেবার সময় পরেশ ডাক্তার সেদিন শুধু এ দুটি কথাই বলে এসেছিলেন নন্দাকে।

গংগার বুকে বিক্রমপুরের এক মাঝির নৌকোয় বসে পরেশবাবু যখন বুড়িগংগার তীরবর্তী এক বাড়ির একটি অতীত কাহিনীর কথা ভেবে ভেবে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, ট্রামে করে বাড়ি ফেরবার পথে নন্দাদেবীর মনেও তখন চল্‌ছে ঠিক ঐ একই বিষয়ের তোলপাড়।

নাম কি তোমার মাঝি?—হঠাৎ প্রশ্ন করেন ডাক্তার।

বংশীধর।

বেশ নামটি তো!

আর বেশ কর্তা!

এমনি কথায় কথায় নৌকো ভিড়ে যেয়ে নিমতলা ঘাটে।

তারও অনেক আগেই হয়তো বাড়ি গিয়ে পৌঁচেছেন নন্দাদেবী।

বিশেষ করে অসহায়া নারী ও শিশুদেরই অকল্যাণ্ড হাউসে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। স্বামী নেই যে নারীর, পিতৃহীন অভিভাবকহীন যে শিশু সে সাহায্যে তাদেরই অধিকার।—ডাক্তারের এই কথাই যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে দোষেরই বা কি আছে তাতে? তাই যদি হয়, সে সাহায্য আমিই বা পাব না কেন? আমার খুকু, আমার অমল……আমাদের কে আর আছে এ সংসারে? সেনেদের বাড়ির ছেলে লোকনাথ প্রায় মাস দুই হলো দেখা করে গেছে। ঢাকার খবর দেবার জন্যে সে অনেক করে আমাদের ঠিকানা সংগ্রহ করেছে। আমাদের বাড়িতে আগুন দেখে সেদিনই রাত্রিতে কোন-রকমে এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছে ওরা। শুধু ওরাই নয়, পাড়ার আরও অনেকে। বাড়ি আমাদের পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। ওঁর নাকি কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি। পরে যারা এসেছে তাদের কাছেও নাকি কোন সন্ধান মেলেনি ওঁর। তবু কি অকল্যাণ্ড হাউস থেকে সাহায্য পেতে পারি না আমরা?—সারা রাত ধরে নন্দাদেবীর মনের সমুদ্রে এমনি সব চিন্তা তরংগায়িত হতে থাকে।

অমল, ঐ ছ্যাখ বাবা আসছে!—ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে ওঠে স্নিগ্ধা। মা তাড়াতাড়ি উঠে বসে হাত বুলিয়ে দেন তার মাথায়। খুকু আবার বিঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে।

খুকুরই ভালো নাম স্নিগ্ধা। ওর বাবারই রাখা নাম।

হঠাৎ নিঃসংগ একটা পাখি ডেকে যায়। কোলকাতায় এসে অবধি এমনি ডাক আর কোন দিন শুনেছেন বলে মনে পড়ে না নন্দার। বড় মিষ্টি ডাক। একা হলেও একা নয়। আত্মজনের সন্ধান পেয়ে পাখিটা যেন আনন্দে গান গেয়ে চলেছে।

খোলা জানালার পথে শেষ রাতের চাঁদ চোখে পড়ে নন্দার। ছোট্ট টুকরো হলেও চাঁদের সে হাসিতে যেন কিসের ইংগিত। নতুন সকাল নতুন কোন আশার বার্তা নিয়ে আসবে বুঝি!

রোজ রাত্তিরে কী বকাই না বকে পাগলী মেয়ে?—সকাল বেলার কাজ থেকে ফিরে এসে খুকুকে আদর করে বলেন মা।

কি হয়েছে, মা?

এই যে কালও স্বপ্ন দেখে ডাকছিলি অমলকে, তোর বাবা এসেছেন বলে! ভুলেও যিনি একবার তোদের খবর নেন না, তাঁর জন্যে স্বপ্ন দেখা!

দেখো, বাবা নিশ্চয়ই আসবেন আমাদের খোঁজ নিতে। —খুকুর এই বিশ্বাসের মধ্যে এতোটুকু সন্দেহের অবকাশ নেই। মেয়ের কথার একটা সহজ উত্তর দিয়ে নন্দা চলে যান ঘরের কাজে। পূর্ব রাত্রির সেই ভাবনার সূত্র তাঁর মনকে আবার আলোড়িত করতে সুরু করে।

ট্রামে-বাসের ভিড় কিছুটা কমে আসে মধ্যাহ্নের অবসানে। তারই সুযোগ নেন নন্দাদেবী। গংগার অদূরবর্তী ইডেন গার্ডেনের পাশে ইট ও পাথরের তৈরি সেই লাল বাড়িটায় এসে উপস্থিত হন তিনি।

এদিকে ওদিকে ঘুরে এপাশে ওপাশে তাকিয়ে কোথাও পাওয়া যায় না পরেশ ডাক্তারকে। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও অমলই তাঁর একমাত্র সংগী অকল্যাণ্ড হাউসে।

এই যে নন্দা, কখন এলে? এ বেশে?

সন্ত পরিচিত কণ্ঠের সবিস্ময় প্রশ্নে নন্দাদেবী মুখ তুলেই দেখেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পরেশ ডাক্তার। কি একটা টুকরো কাগজ তাঁর হাতে।

এ বেশ কেন, জিগ্যেস করছেন ? রিলিফের আশায়—ফ্রি রেশনের আশায়। হয়তো মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া হয়নি এতে। আপনার বন্ধুর কোন সন্ধানই কেউ রাখে না। দাংগায় ঢাকার বাড়িঘর ভস্মীভূত। তিনিও আছেন কি না—

ছিঃ নন্দা !—তিরস্কারের সুরে বাধা দেন ডাক্তার, অবাক দৃষ্টিতে নন্দার সিঁদুর-ধোয়া সিঁথি, খালি হাত আর পরিধানের থান কাপড়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আগের দিনের আধ-ময়লা শাড়িখানাই আজ এই থান কাপড়ে রূপান্তরিত হয়েছে। লাল পাড়টা যে জোর করে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে তাও চোখে পড়ে পরেশবাবুর।

সঠিক কোন খবর না পেয়ে এ বেশ নিতে পারলে নন্দা ? আশ্চর্য !

ওয়াণ্ডারফুল ! আমি আরো বেশি আশ্চর্য !

একটা দুর্বল কণ্ঠের আওয়াজে সচকিত হয়ে ওঠেন পরেশ-বাবু। পিছন ফিরে তাকিয়েই দেখেন কে একজন সাহায্য প্রার্থনা করছে হাত বাড়িয়ে। মানুষ নয়, মানুষের জীবন্ত কংকাল। এসব দেখে দেখেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন বলে ভয়ে আঁৎকে ওঠেন নি ডাক্তার। তা নইলে হয়তো দৌড়ে পালাতে হতো। বরং লোকটার দুর্দশার কাহিনী শোনার জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠেন তিনি। জিগ্যেস করেন লোকটাকে—

কি বলছ ?

না, আর কিছুই বলার নেই আমার। কিছু সাহায্য চাই শুধু। সেই কবে ঢাকা থেকে এসেছি, সেই থেকে এক ফোঁটাও মদ পেটে যায়নি। দাও না ভাই, আজ বড্ড খেতে ইচ্ছে করছে। —ক্ষীণ স্বরে লোকটি প্রার্থনা জানায়।

আহার্যের জন্যে নয়, মদের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা !

ভিক্ষা-বৃত্তির এই অভিনবত্বে অবাক হয়ে যান ডাক্তার। নন্দাদেবীও নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন লোকটির দিকে।

কী, চুপ করে রইলে যে!—এবারে কণ্ঠস্বর বেশ একটু উঁচু!

কোটরগত ছুটো চোখের ভেতর থেকে ঘৃণা ও উষ্মা ঠিকরে বেরোয় যেন। অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ দেহ, ধুলো-বালি নোংরায় কদাকার লোকটির মাথায় কতোদিন যে তেল জল পড়েনি তার ঠিক নেই।

বাইরের চেহারায় সভ্য সমাজের কোন ছাপ না থাকলেও আগন্তুকের কথাবার্তা কিন্তু বেশ গোছানো! তা ছাড়া এর আচরণে কোথায় যেন আত্মজনের আব্দারও বর্তমান।

ঠোঁটে আংগুল ঠেকিয়ে চিন্তার সমুদ্র মন্থন করে সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন পরেশবাবু। আকাশের দিকে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে ভাবতে থাকেন তিনি।

কী ভাবছ? আমার কাছ থেকে কতো টাকা নিয়েছ তারই অংক কষছ বুঝি? থাক, তার দরকার নেই কিছু। আর সবইতো তুমি নিয়েছ। তা নাও। আজ গোটা পাঁচেক টাকা পেলেই আমি খুশি। বড্ড পিপাসা, বুঝলে ডাক্তার! বড্ড পিপাসা!!

এসব কথার কোন উত্তর খুঁজে পান না পরেশবাবু। লোকটা জানলে কী করে যে তিনি ডাক্তার! তা ছাড়া আবার টাকার কথা, টাকার কথা তুলছে!

কেমন একটা আকস্মিক ঘূর্ণিবাত্যা খেলে যায় পরেশ ডাক্তারের মাথায়। কেমন যেন সব তাল গোল পাকিয়ে যায়। ব্যাকব্রাস করা চুলের ভেতর ডান হাতের আংগুলগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে তবু একবার ভাবতে চেষ্টা করেন ডাক্তার। তবে কি……

বাঃ, বেশ পোষাক তো! খাসা মানিয়েছে কিন্তু!— এবার নন্দার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বলে আগন্তুক।

নন্দাদেবী হঠাৎ মূর্ছিতা হয়ে পড়ে যান মাটিতে। কিছুক্ষণ ধরেই তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করছিলেন লোকটিকে। হঠাৎ তাঁর পা দুটো যেন আলগা হয়ে গেল মাটি থেকে।

ট্যাক্সি!

একটা চলতি ট্যাক্সি পরেশবাবুর কম্পিত কণ্ঠের ডাকে এগিয়ে আসে সঙ্গে সঙ্গে।

একটু পরেই আগন্তুক সহ সবাইকে নিয়ে ট্যাক্সিটা ধূলো উড়িয়ে উধাও হয়ে যায় সেখান থেকে।

এবার ছেলের জন্যে মায়ের নয়, মায়ের জন্যে অমলের কান্না ভেসে আসছিল কয়েক সেকেণ্ড ধরে।

যাই হোক, ট্রেন থেকে নেমে খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হয়নি, এই রক্ষে!

ভাদুড়ী মশাই দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন যেন।

একেবারে নতুন জায়গা। তার ওপর প্রথম বারেই সপরিবারে চলে আসাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি, চলতি ট্রেণে অনেকক্ষণ ধরে এ কথাটাই যেন পেয়ে বসেছিল ভাদুড়ীকে। এরপরে কেউ যদি ষ্টেশনে এসে আগে থেকে উপস্থিত না হয়ে থাকে, তা হলেই তো বিপদ!

এমনি সব দুর্ভাবনার বোঝা বইতে বইতে পানাগড় ষ্টেশনে এসে গাড়ি থেকে নেমেই তাই চেনামুখের তল্লাস সুরু করে দেন ভাদুড়ী।

ভাদুড়ী মশাই এসেছেন, ভাদুড়ী মশাই!—দু পা এগুতেই একটা ব্যাকুল চিৎকার কানে ভেসে আসে ভাদুড়ীর।

এই যে এখানে।—পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে ভাদুড়ী সামান্য একটু আসতেই একেবারে প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েন রাধারমণ পণ্ডিতের।

দেবশালা মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত রাধারমণ সরকার। হেড মাষ্টার হবার সখই ছিলো তাঁর পুরোপুরি। পুরোনো হেড মাষ্টার যে এখানকার চাকরি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন, সে তাঁরই জন্যে। ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও যেমন সবাই তাঁকে বাঘের মতো ভয় করে, আবার ঠিক তেমনি সবাই তাঁর একান্ত অনুগতও।

কিন্তু হলে কি হবে, তাঁর হেড মাষ্টার হবার আশা কোন দিনই পূর্ণ হবার নয়। ট্রেনিং পাশ না হলে কিছুতেই হেড মাষ্টারি করা চলবে না, এ বিষয়ে সেক্রেটারীর মত অত্যন্ত দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট। আর সেক্রেটারীর যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করার দুঃসাহস কোন দিনই হবে না রাধারমণের। তবে হেড মাষ্টারকে গোড়া থেকে হাত করে রাখতে পারলেই যে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে এ কথাটা তিনি ভালো করেই বুঝে নিয়েছেন। তাইতো সুরু থেকেই সেরূপ চেষ্টাই চলছে।

আরে কেষ্টা, মাষ্টার মশাইর হাত থেকে পুঁটলিটা আগে নিয়ে নে। হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? প্রণাম করেছিস?

প্রণাম করার কথা উচ্চারণ করতেই কেষ্টা, পান্ত, শ্যামল, সোনা এবং আর সবাই একেবারে ধপাস্ ধপাস্ করে পায়ের ধূলো নিতে সুরু করে দেয় মাষ্টার মশাইর।

ওরা সব দল বেঁধে ষ্টেশনে এসেছে সেকেণ্ড পণ্ডিতের সঙ্গে নতুন হেড মাষ্টারকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে। ওদের কারুর পরনে ছেঁড়া প্যান্ট, কারুর বা পাজামা, আবার কেউ বা এসেছে ময়লা এক টুকরো কাপড় পরে। দু-তিন জনের গায়ে নোংরা গেঞ্জি বা ফতুয়া দেখা গেলেও ছেলেদের অধিকাংশই এসেছে খালি গায়ে এবং তারা প্রায় সবাই কঙ্কালসার।

সুদূর পল্লীর এই চেহারা দেখে মুহূর্তের জন্যে আঁৎকে ওঠেন ভাদুড়ী।

এই তো আমার দেশ, এই তার আসল রূপ! এরই সেবার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের সবাইকে। তা হলেই এর রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে।—নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে একটু ভাবেন নতুন হেড মাষ্টার।

হ্যাঁরে পান্ত, ভানু, পাগলা তোরা সবাই এক একটা

করে জিনিষ-পত্র নিয়ে চল এবার। মা-মণির হাত থেকে স্যুটকেশটা নিয়ে নে কেউ। ছিঃ ছিঃ, তোরা এতোগুলো ছেলে থাকতে মা-মণি বোঝা নিয়ে চলবেন? তোরা দেখছি সব জানোয়ার বনে গেছিস একেবারে!

না, না, ওদের গাল-মন্দ করবেন না, পণ্ডিত মশাই! আর ওদের ওপর কোন বোঝাও চাপাবেন না জোর করে। ওদের এই শরীরে কতোটুকুই বা আর শক্তি আছে! হাতে হাতে যতোটা পারা যায় তা বরং আমরাই নিয়ে নিচ্ছি। আপনি একটা কুলি ডেকে দিন, তাতেই হয়ে যাবে।—বেশ একটা সহানুভূতির সুর বেজে ওঠে ভাদুড়ীর কথায়।

নতুন হেড মাষ্টারের সস্নেহ উক্তি ছেলেদের মন খুশিতে ভরে তোলে, কিন্তু তাঁর এই একটি মাত্র কথায়ই রাধারমণ টের পেয়ে যান যে, এঁকে ঘায়েল করা খুব সহজ হবে না।

রাধারমণকে চিনতে ভাদুড়ীর একটুও দেরি হয়নি। ঠিক এই পোষাকেই তিনি তাঁকে দেখেছিলেন তাঁদের হাওড়ার স্কুলে। দেবশালা মাইনর স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গী হয়ে তিনিও গিয়েছিলেন তাঁর সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করতে। সেই তেল-চিট্‌চিটে জামা কাপড় অর্থাৎ হাতকাটা ফতুয়া আর ধুতি আর তালি-সর্বস্ব একজোড়া চটি, রাধারমণ পণ্ডিতের এই পোষাক-পরিচ্ছদের কথা ভাদুড়ীর ঠিক মনে আছে। তাঁর এই জামা-কাপড়ে কোন ধুলো-বালি ও ময়লাই যে আর নতুন করে কোন রেখাপাত করতে পারে না, একথা সেই এক মাস আগেই তাঁর মনে হয়েছিল এবং সে কথা যে নিতান্তই ঠিক তার প্রমাণ তিনি আজও পেলেন প্রথম সাক্ষাতেই।

সত্যি সত্যি একেবারে পাকা রঙ হয়ে গেছে রাধারমণের জামাকাপড়ের। এর ওপর নতুন করে আর কোন রঙ ছাপ ফেলতে পারে কখনো? কিছুতেই না।

একটা কুলিকে ডেকে নিয়ে এসে তার মাথায় যতোটা সম্ভব বোঝা চাপিয়ে দেন রাধারমণ। তারপর বাকি সব জিনিষ-পত্তর হাতে হাতে নিয়ে তাঁরা রওনা হলেন গ্রামের দিকে।

ষ্টেশনের বাইরেই পাঁচ সাতখানা গরুর গাড়ি অপেক্ষা করছে যাত্রী নেবার জন্তে। তার মধ্যে দুখানা দেবশালা জমিদার-বাড়ির। একখানায় হেড মাষ্টার, তাঁর স্ত্রী ও পুত্র কন্যাকে বেডিং ও স্যুটকেশ সহ তুলে দিয়ে আর একখানা গাড়িতে ছেলের দল ও আর সব খুচরো জিনিষ-পত্তর নিয়ে উঠে পড়লেন রাধারমণ।

উঁচু-নীচু গ্রাম্য রাস্তায় গরুর গাড়ি হেলে-দুলে এগিয়ে চলে। বিছানো চটের তলাকার খড়ের গাদা মচমচ করে ওঠে। অনীতা ভয় পায়। গাড়ি উল্টে যদি পড়ে যায়, এই ভয়। শুধু অনীতাই বা কেন, তার মা-ও ভয়ে ভয়ে শক্ত করে ধরে থাকেন গাড়ির এক ধারে বাঁধা একটা বাঁশকে।

হেড মাষ্টারেরও গরুর গাড়ি চড়ার এই নতুন অভিজ্ঞতা। তাই মন দুলে ওঠে ভয়ে ভয়ে। কিন্তু মনের ভয় বাইরে প্রকাশ করা চলে না কিছুতেই। তা হলে যে স্ত্রী আর কন্যাকে মোটে সামলানোই যাবে না। ছেলে নন্তুর ভয়-ডর নেই, গরুর গাড়িতে চড়ে তার বরং আনন্দই হয়েছে খুব।

পিছনের গাড়িতে রাধারমণের নেতৃত্বে ছাত্রদল খুব হৈ-হল্লা করতে করতেই অগ্রসর হতে থাকে। এক এক বার 'নতুন হেড মাষ্টার কি জয়' ধ্বনি ওঠে ওদের গাড়ি থেকে। আবার এক এক সময় সমবেত কণ্ঠের গানও শোনা যায়।

চোখের অন্তরালে থেকেও রাধারমণ এ ভাবে ভাদুড়ীর মনে রেখাপাত করার চেষ্টা করতে থাকেন সুরু থেকেই।

দেখতে দেখতে গাড়ি একটা জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে যায়। গাড়োয়ানটাকে দেখা গেল, গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে

পড়েই সে শালগাছের ডাল-পালা ভাঙতে সুরু করেছে। প্রথমটায় মনে হয়েছিল, গাড়ি হয়তো গন্তব্যস্থলেই এসে গেছে। কিন্তু নির্জন শালবনের মধ্যে গাড়োয়ানকে এ ভাবে গাছের ডাল ভাঙতে দেখে ভয়ে-ভয়ে নবাগতদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায় একেবারে।

ভাদুড়ী মশাই এক বার পিছনের গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সে গাড়িতে তো আরো ভীষণ ব্যাপার! সেখানে সবাই মিলে লাফিয়ে লাফিয়ে এক একটা করে ডাল ভাঙছে আর পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলছে চার দিকে।

সকলেই যখন একই রকম কাজে মেতে উঠেছে তখন নিশ্চয়ই এর কোন গূঢ় অর্থ রয়েছে।—ভাদুড়ী ভাবেন মনে মনে।

গাড়োয়ান, এ কি ব্যাপার তোমাদের বল তো?

বাবুজী, এ এক বনদেবতার ঠাঁই। এখানে শালপাতা দিলে 'ভুলো' লাগে না। এই বিরাট শালবনে পথ ভুল করে কি কম হয়রাণি হয় লোকের? তার থেকে রেহাই পাবার জন্যেই সবাই এখানে শালপাতা দিয়ে প্রণাম জানায় বনদেবতাকে।

গাড়োয়ানের কথায় আশ্বস্ত হন ভাদুড়ী। গাড়িও আবার চলতে সুরু করে।

এ শালবনের কি শেষ নেই? সেই প্রায় ষ্টেশনের গা থেকে আরম্ভ করে এই যে চলছে তো চলছেই। এখনো তো এর শেষ হবার কোন রকমই দেখা যাচ্ছে না। এমনি বনে পথ ভুল হওয়া তো স্বাভাবিক।—গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাদুড়ীর আলাপ চলে এই নিয়ে।

তাইতো বাবু এই মাঝ পথে এসে বনদেবতার কাছে বরভিক্ষা, যেন ভুলো না লাগে। সেই কোন্ কালে দেবতা

নাকি স্বপন দেখিয়েছিলেন গাঁয়ের জমিদারকে শালগাছের ডাল ভেঙে বেদীর ওপর পাতা ছড়িয়ে দিতে। তা হলে এই বনপথে তাঁর আর কোন আপদ-বিপদ ঘটবে না, এমনি আশ্বাস নাকি পেয়েছিলেন জমিদার। সেই থেকেই এই ব্যবস্থা চালু হয়ে আসছে এতো কাল ধরে। জমিদারই ঐ বেদী তৈরি করে দিয়ে গেছেন পথের পাশে। প্রজাদেরকেও অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে স্বপ্নাদেশ পালনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন সকলকে।

তাই নাকি! তা হলে তো বেশ ভালোই বলতে হবে জমিদারকে।

সে কথা মোটেই মিথ্যে নয় কর্তা! তবে সেই পুরোনো আমলের জমিদারের সঙ্গে এ কালের জমিদারের তুলনা হয় না কোন। এ পথে কি আগে বেশি লোক একত্র না হয়ে চলার জো ছিল? 'মেটে' দস্যুদের হাতে পড়ে কতো লোকের যে আগে মুণ্ডুপাত হতো, তার হিসেব-নিকেশ নেই কোন। পথ ভুলিয়ে তারা পথিকদের সব লুঠপাট করে নিয়ে যেতো। খুন করে লাস গুম করে ফেলতো যখন তখন। এক বার জমিদার-কন্যার শ্বশুরালয়ে যাবার পথে জমিদারেরই ছ জন লোক খুন হয়ে যায় 'মেটে'দের হাতে। কন্যার সমস্ত গহনাপত্র লুঠ করে নিয়ে যায় তারা তাদের কাছ থেকে। সেবারই নাকি জমিদারের ওপর স্বপ্নাদেশ হয়। তিনি তখন এই শালবনের মধ্যপথে বেদী প্রতিষ্ঠা করে কয়েক জন পাহারাদার বসিয়ে দেন সেই বেদীর পবিত্রতা রক্ষা করার জন্যে। সেই থেকে শালবনের এই পথে চলাচল অনেকটা নিরাপদ হয়েছে। আজকাল আগেকার মতো পাহারাদারের ব্যবস্থা না থাকলেও খুনখারাপি আর তেমন বড়ো একটা ঘটে না। তবু লোকে আসতে-যেতে ঐ বেদীকে উপলক্ষ্য করে অভ্যাস বশেই শালগাছ

থেকে ডাল ভাঙতে আর পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলতে ভুল করে না কখনো।

গাড়োয়ানের কথাগুলো এক মনে শুনে যান ভাদুড়ী মশাই। তার কথা থেকে এটুকু স্পষ্ট করেই বুঝে নেন, গাঁয়ের বর্তমান জমিদার তেমন সুবিধার লোক নন। অথচ এই জমিদার-বাড়িতেই নাকি তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন সেক্রেটারী। জমিদারের সঙ্গে আবার গোলমাল লেগে যাবে না তো ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে? ভাদুড়ী কেমন যেন একটু ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন মনে মনে। পুত্রকন্যা ও গৃহিণীকে নতুন জায়গায় একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা এবং কথাবার্তা বলার জন্যে সাবধানও করে দেন আগে থেকেই।

খুব কড়া মেজাজী লোক নাকি হে তোমাদের জমিদার? —গাড়োয়ানকে নতুন প্রশ্ন জিগ্যেস করেন ভাদুড়ী।

কড়া-টিলা বুঝি না কর্তা, অত্যন্ত হিসেবী মানুষ। আধ পয়সা এদিক-ওদিক হলেই তিরিক্ষী হয়ে ওঠেন। খোকা-বাবুর সঙ্গে তো রাত-দিন তাই নিয়েই লেগে আছেন। এদিকে যে জমিদারী লাটে উঠতে বসেছে, আজ হোক, দু দিন বাদে হোক, সরকারী আইনে যে সব কেড়ে নেওয়া হবে সেদিকে কি ভাবছেন জানি না। তবে প্রজা-দের সুখ-সুবিধার জন্যে একটা পয়সা খরচ করতে বুড়ো জমিদারের যেন প্রাণ বেরিয়ে যায়। খোকা জমিদারের অন্তরটা ভারি বড়ো কর্তা। ভগবান করুন তাঁর জয়-জয়কার হোক!

এর পর আর কোন কথা বাড়ালেন না নতুন হেড মাষ্টার। গাড়োয়ানের কথাবার্তা থেকেই জমিদার বাড়ির ভেতরকার অবস্থা মোটামুটি বুঝে নিয়েছেন তিনি।

ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করতে করতে এগিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি।

সবাই এক রকম চুপচাপ। একমাত্র গাড়োয়ানই মাঝে-মাঝে শালবনের নীরবতা ভাঙবার চেষ্টা করে গানের সুর তুলে।

রাধারমণের গাড়ি এতোক্ষণে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। তাহলেও ওদের গাড়ির হৈ-হল্লার শব্দ খানিক খানিক ভেসে আসে বাতাসে বাতাসে।

ঐ যে বিরাট একটা দুর্গের মতো দেখা যাচ্ছে, ওটা কাদের বাড়ি হে গাড়োয়ান?

ঐ তো জমিদারবাড়ি, কর্তা! বাড়ি বলতে ঐ একখানাই বাড়ি আশ-পাশের দুই তিন গাঁযের মধ্যে। আর সবই তো কুঁড়ে-ঘর।

পাঁচ মাইলব্যাপী শালবনের শেষ প্রান্ত পেরিয়ে গাড়ি এসে নামে গাঁয়ের পথে। চাদরটাকে গুছিয়ে এক বার ঝেড়ে নিয়ে কাঁধে ফেলে নেন ভাদুড়ী। হেডমাষ্টার-গিন্নী হেমাংগিনী ও কন্যা অনীতাও গাড়ির মধ্যে একটু নড়ে-চড়ে বসে ঠিক হতে থাকেন। হাফপ্যাণ্ট ও খাকির হাফসার্ট-পরা নন্তুর তো কোন হাংগামাই নেই। সে সব সময়েই সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত।

এই অশথতলায় একটু বিশ্রাম করে নিই কর্তা, নরহরিটাও ততক্ষণে এসে পড়বে। আরো আধ মাইলটেক পথ বাকি। এটুকু এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।—এই বলে ভাদুড়ীর গাড়ির গাড়োয়ান শ্যামসুন্দর গাড়ি থেকে নেমে আসে হুঁকো আর কল্কেটা নিয়ে। গ্রামে পৌঁছুবার আগে ধূমপান করে একটু চাঙা হয়ে নেবে আর কি।

আপনারাও একবারটি ঘুরে ফিরে নিন না কর্তাবাবু! অনেকক্ষণ তো বসে আছেন একটানা।—শ্যামসুন্দর গরু দুটোকে খানিকক্ষণের জন্যে গাড়ি থেকে খুলে দেয়। তারপরে অনেকটা পরামর্শের সুরেই অনুরোধ জানায় হেড মাষ্টারকে।

বেশ তো জায়গাটা। চলো, ঐ মন্দিরের দিকটায় একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

স্ত্রী আর পুত্র-কন্যাকে নিয়ে ভাহুড়ী মশাই দেবশালা গ্রামের প্রবেশ-পথে শিবমন্দিরে প্রণামের সুযোগ পেয়ে ধন্য মনে করলেন নিজেকে।

মন্দির থেকে ফিরে আসতে আসতেই দেখা গেল, নরহরির হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে রাধারমণ কষে টানছেন আর ধোঁয়া ছাড়ছেন ভুর-ভুর করে।

ভাহুড়ী মশাইর দিকে চোখ পড়তেই লজ্জায় জিভ কেটে হুঁকোটাকে এক পাশে সরিয়ে ফেলেন সেকেণ্ড পণ্ডিত।

এই যে পণ্ডিত মশাই, আপনারাও চলে এসেছেন এরই মধ্যে। ভালোই হয়েছে।—এর আগে কিছুই যেন দেখতে পাননি এমনি ভাব করে বলেন হেড মাষ্টার।

হ্যাঁ, এই তো এলাম। আপনারাও এই অবসরে একটু বেড়িয়ে এলেন বুঝি ? বুড়ো শিবের ঐ মন্দিরের খুব নামডাক এ অঞ্চলে। শনিবারে শনিবারে খুব ধূমধাম করে পুজো দিতে আসে আশ-পাশের সব গ্রামের লোকেরা। অনেক রকমের মানত থাকে। সেই মানতের পুজো দিয়ে নাকি অনেকেই ফল পেয়েছেন। বুড়ো শিবের মন্দিরে পূজার্থীর ভিড় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। দেবশালার পুরোনো জমিদারদেরই প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। গাঁয়ের লোকেরা জাগ্রত দেবতা বলে মনে করে এই বুড়ো শিবকে।

ও তাই নাকি ! তাহলে তো ভালোই হয়েছে দেখছি এখানে নেমে। প্রণামটাও সেরে নিয়েছি। কিন্তু তা নয় হলো, কতোক্ষণ আর দেরি করতে হবে তাই বলুন দেখি ? দিনমানে বাড়িতে যেয়ে উঠতে পারলেই ভালো হতো। আবার একটু গোছগাছ করেও তো নিতে হবে।

তা যা বলেছেন মাষ্টার মশাই, বেশ ভালো করে গুছিয়ে না বসলে চলবে কেন? এ তো আর আমরা নই, একজন হেড মাষ্টার! রীতিমতো মানানসই ভাবে জাঁকিয়ে বসতে না পারলে চলে কখনো? কি বলো মা অনীতা! তবে তার জন্যে লোকজনের কোন অভাব হবে না, কোন অসুবিধাও হবে না। তার ওপর অনীতা মা রয়েছে, আমরাও তো রয়েছি। এর পরে আর ভাবনাটা কি আপনার?

তা ঠিক, তা ঠিক!—এই বলে এ আলোচনায় দাঁড়ি টানেন হেড মাষ্টার।

ও নরহরি, আরে শ্যামসুন্দর! খুব বিশ্রাম হয়েছে, আর দেরি করিসনি। চল্ এবার।

রাধারমণের ডাকে নিজ-নিজ গাড়িতে গরু জুড়ে দেয় নরহরি আর শ্যামসুন্দর।

আসুন কর্তা, মাকে দিদিমণিকে নিয়ে উঠে পড়ুন তা হলে। আর তো আধা ঘণ্টার ব্যাপার, দেখতে দেখতে চলে যাব।

শ্যামসুন্দরের গাড়ি এবারও আগে আগেই চলে। নরহরির গাড়ি অবশ্য আসে ঠিক পিছনে পিছনেই।

সন্ধ্যা হয়ে আসে আসে। পশ্চিম আকাশ জুড়ে আবির ছড়িয়ে দিয়ে তার অন্তরালে যেন পালিয়ে চলেছেন সূর্যদেব। দু খানা গাড়িও ছুটে চলেছে পশ্চিম দিকে যেন সূর্যেরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

আর তো মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। কিন্তু তবু যেন আর তর সয় না। দু জোড়া গরুকেই লাঠির খোঁচায়-খোঁচায় উত্তেজিত করে তোলে গাড়োয়ানরা আরো জোরে ছুটে চলতে। একটু ঝিমিয়ে পড়লেই 'হট্, হট্, হট্', বিচিত্র-বিকট এই মুখের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দমাদ্দম লাঠি পড়ে গরুর পিঠে। আর

লেজ ধরে জোর মোচড় দিতেই ঘোড়ার মতো লাফিয়ে চলতে সুরু করে জোড়া বলদ।

এমনি ভাবেই পথের শেষ করে আনে শ্যামসুন্দর আর নরহরি।

গাড়ি দু খানা জমিদার-বাড়ির সদর দরজায় এসে থামতেই নতুন হেড মাষ্টারকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসেন সেক্রেটারী শশধর গাংগুলী ও জমিদার-নন্দন সুমন্ত চক্রবর্তী।

সেক্রেটারী জমিদারের ভাগিনেয়। নিজে বাতব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে পড়ার পর পুরোনো আমলের এই স্কুলটার পরিচালনার ভার ভাগিনেয় শশধরের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন জমিদার। কিন্তু তা হলেও স্কুলের কাজকর্ম প্রায় পৌনে ষোল আনাই চলে জমিদারেরই পরামর্শ মতো, যদিও বাইরের লোকদের ধারণা ঠিক তার উল্টো।

এই যে, আসুন আসুন ভাদুড়ী মশাই! কোন কষ্ট হয়নি তো পথে?—সেক্রেটারী এই বলে নতুন হেড মাষ্টারকে হাতে ধরে নামান গাড়ি থেকে। তার পর একে একে নেমে আসে অনীতা এবং তার মা। অনীতা হাত জোড় করে নমস্কার জানায় শশধর আর সুমন্তকে। সুমন্ত ভুল করে না তাকে প্রত্যভিবাদন জানাতে। শশধর কিন্তু হেড মাষ্টারকে নিয়েই অত্যধিক ব্যস্ত। অন্য কোন দিকে চোখ দেবার তাঁর অবসর নেই যেন।

প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকা। অতীত জাঁক-জমকের নীরব সাক্ষ্য। ইট-সুরকি খসে খসে পড়ছে সেই প্রাসাদের গা থেকে। তা আর সারিয়ে নেবার দিকে দৃষ্টি নেই কারুর, ক্ষমতাও নেই বোধহয় আর জমিদারের। তা হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে সতর্ক নজর এ বাড়ির ঝি-চাকর আর মালীদের।

বিরাট বাড়ির এক নিরিবিলি কোণে হেড মাষ্টারের

জন্যে নির্দিষ্ট অংশে উপস্থিত হয়েই প্রথম প্রথম সকলেরই কেমন যেন একটু ভয়-ভয় লাগে। কিন্তু সে সাময়িক মাত্র।

সুমন্তর আশ্বাসে অনীতাও যেমন আশ্বস্ত হয়, তেমনি তার মা। তবে ভয় কেটে গেলেও এ বাড়ির অস্বাভাবিক নীরবতা সকলকে বিস্মিত করে। জমিদার, জমিদার-গৃহিণী ও তাঁদের একমাত্র পুত্র সুমন্ত ছাড়া পরিবারে আর কেউ না থাকলেও বাড়িতে দাস-দাসী এবং অন্যান্য লোকজনের আনাগোনার তো অভাব নেই। কিন্তু তবু যেন এ পুরীতে সব কাজ কলের পুতুলের মতো চলে, কারুর মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

এরূপ নীরবতার অবশ্য যথার্থ কারণও আছে। সে কারণ জানা গেল পরদিন কর্তা বাবু ও গিন্নী মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে।

ছেলে সুমন্তের সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারে তীব্র মতভেদ দেখা দেওয়ায় কর্তা বাবু এক মাত্র পুত্রের মুখ দর্শনেও নারাজ।

মানসিক উত্তেজনায় বাতব্যাধিগ্রস্ত জমিদার আরো বেশি পঙ্গু হয়ে পড়েছেন সম্প্রতি। এখন আর ভালো করে কথাও বলতে পারেন না। অবশ্য কথা বলতে বারণও রয়েছে ডাক্তারের। তবু কেউ কাছে এসে দু দণ্ড বসলে যেন একটু আনন্দ বোধ করেন তিনি, কিন্তু সুমন্তর দর্শন তাঁর কাছে অসহ্য।

অবশ্য চোখে একরকম দেখতেই পান না জমিদার। একটি চোখ তাঁর যৌবনেই নষ্ট হয়েছে যৌনব্যাধির ফলে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় অপর চোখটির দৃষ্টিশক্তিও প্রায় নিঃশেষিত। তবুও তাঁর ঘরে কে আসে যায়, তার কোন কিছুই বুঝতে বাকি থাকে না তাঁর। প্রবল অনুভব শক্তিই তাঁকে সব বুঝিয়ে দেয়।

কে?—পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই চমকে উঠে প্রশ্ন করেন জমিদার।

আমি ভাদুড়ী।

ও, আমাদের নতুন হেড মাষ্টার। আর এরা?

আমারই মেয়ে অনীতা, ছেলে নন্তু আর......।

বুঝেছি, বেশ, বেশ। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো? আর এখানেও থাকার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

না, না, মোটেই না। আপনি এ জন্যে একটুও ভাববেন না।

আর কথা বলা ঠিক হবে না কর্তাবাবুর সঙ্গে, দূর থেকে ইসারায় জানায় সুমন্ত।

আচ্ছা, আজ যাই আমরা। আবার তো আর একটু পরেই স্কুলে যেতে হবে।

তাহোক, তবু বসুন না আব একটু।—এটুকু বলেই যেন একটু হাঁফিয়ে পড়েন জমিদার। বেশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস বইতে সুরু করে তাঁর।

আজ্ঞে, আজ প্রথম দিন, তাই একটু বেশি তাড়া।

বেশ।—এই বলে জমিদার বিদায় দেন হেড মাষ্টারকে।

প্রকাণ্ড একটা হলঘরের মধ্যে পুরোনো কালের বহু বিচিত্র এক মজবুত পালংকে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত জমিদার তারাচরণের মাথায় পুরোনো ঘি মালিশ করছিলেন তখন গৃহলক্ষ্মী সৌদামিনী। ভাদুড়ী মশাই ও তাঁর স্ত্রী-কন্যার ভুল হয় না তাঁকেও প্রণাম করতে। কিন্তু তাঁর বেদনা-মলিন মুখখানা দেখে তাঁদের মনও যেন বিষাদে ভরে ওঠে।

দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট এই গ্রামাঞ্চলের মাঝখানে অতীত ঐশ্বর্যের কিছু অংশ এখনো মজুত আছে এই একটি মাত্র বাড়িতে। তার মধ্যে থেকেও এতো দুঃখ সৌদামিনীর!

আর তারাচরণই কি সুখী? তা হলে তাঁর দু চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়বে কেন?

ভাদুড়ীর লক্ষ্য এড়ায়নি জমিদারের সেই অশ্রুরেখা।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য যে অভিশাপ, তারাচরণ আর সৌদামিনীই তার প্রমাণ।

স্বামীর যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা সৌদামিনী মুখ বুজেই সহ্য করেছেন। অত্যধিক পানাসক্তি ও অমিতাচারে পঙ্গু স্বামীর সেবা-যত্নেও কুণ্ঠা নেই তাঁর। কিন্তু একমাত্র পুত্রের সঙ্গে পিতার বিচ্ছেদের মর্মদাহে তিনি অর্ধমৃতা হয়ে কোন রকমে বেঁচে আছেন মাত্র।

তারাচরণেরই কি কম মনোবেদনা? জলের মতো তিনি অর্থের অপচয় করেছেন যৌবনে এবং তাতে ক্ষণিক আনন্দের বিনিময়ে পেয়েছেন রোগ, যন্ত্রণা ও অস্বাস্থ্য। সেই অনুতাপে আজ জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে তাঁর সারা অন্তর। অসহ্য যাতনায় প্রতি মুহূর্তেই তিনি কামনা করেন মৃত্যুকে।

কিন্তু সাত পুরুষের জমিদারীর মোহ কর্তাবাবু কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেন না। কী অবর্ণনীয় যে তার আকর্ষণ, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। আর তা নিয়েই তো একমাত্র সন্তান সুমন্তর সঙ্গে তাঁর বিরোধ, শুধু বিরোধ নয় একেবারে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ।

•

জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হয়েছে দেশে।

এক এক করে জমিদারী দখল সুরু করবেন সরকার, এরূপ ঘোষণাও সম্প্রতি প্রচারিত হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ আয়োজনও সুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সকল জমিদারেরই এ নিয়ে সমান দুশ্চিন্তা। কতোটুকু কি ভাবে রক্ষা করা যায় সরকারের কবল থেকে!

বসতবাটী সমেত এক শ বিঘে জমি বাস্তু ভিটে হিসেবে রেখে বাকি সমস্ত জমিদারী দেবোত্তর করে দিলেই সরকারের

হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। এই পরামর্শ দিয়েছেন শরৎ হালদার, সুরেন ঘটক, শৈলেন আচার্য প্রভৃতি পারিষদবর্গ এবং তারাচরণও অবস্থা বিপাকে তা-ই একমাত্র করণীয় বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সুমন্ত তার ঘোর বিরোধী।

জমিদার-পুত্র হলেও নতুন ভাবধারার স্পর্শ লেগেছে সুমন্তর মনে। দেশ আজ আর পরাধীন নয়, বিদেশী শোষণের পথ আজ অবরুদ্ধ। জাতির কল্যাণে জাতীয় সরকার যখন জমিদারীর বিলোপ সাধন প্রয়োজন বলে স্থির করেছেন, তখন দেবোত্তরের আবরণে সেই জমিদারীকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাকে দেশবাসীকে প্রতারণার নামান্তর বলেই মনে করে সুমন্ত। এ সে কিছুতেই হতে দেবে না।

অথচ পূর্বপুরুষের আত্মার তৃপ্তির জন্যে তাঁদের স্মৃতিপূত জমিদারী যেমন করেই হোক রক্ষা করতেই হবে, এই হলো তারাচরণের সংস্কারবদ্ধ ধারণা।

এই দুই মতের মধ্যে কোন মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তাই উভয় পক্ষের জেদ একটা চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছিল।

ঠিক এমনি সময়েই রংগমঞ্চে এসে অবতীর্ণ হলেন সপরিবারে নতুন হেড মাষ্টার ভাদুড়ী মশাই।

কর্তাবাবু ও কর্তামাকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে আসার সময় হঠাৎ কর্তার মাথার দিকের দেয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিরাট তৈলচিত্রখানি প্রথমেই চোখে পড়ে অনীতার। সে তার মাকে ডেকে দেখায় সেই ছবিখানি।

মা দেখেছো, কী সুন্দর ছবি? যেন জীবন্ত বসে আছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া?

বাঃ, ভারি চমৎকার তো!—এই বলে মা আর মেয়ে আর সব দেয়ালের বড়ো বড়ো তৈলচিত্রগুলোর দিকে তাকাতে

যেয়ে চোখ নামিয়ে আনতে বাধ্য হন সংগে সংগেই! বিচিত্র বিসদৃশ সব নগ্ন উলংগ নারীমূর্তি দেখে শিউরে ওঠে অনভিজ্ঞ অনীতা এবং তার মা-ও। জমিদারের শিল্পবোধ আঘাত হানে তাদের রুচিবোধের ওপর। কিন্তু এ নিয়ে কোন কিছু তো আর মুখ ফুটে বলার উপায় নেই সেখানে? তাই তাঁরা ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় যাবার সিঁড়ি ধরে নেমে যান নিচের দিকে। নামতে নামতেও সিঁড়ির দুপাশের দেয়ালে তেমনি সব নগ্ন ছবিই চোখে পড়ে তাঁদের। মন তাঁদের বিষিয়ে ওঠে তাতে।

রাধারমণ পণ্ডিতকে বলে দেওয়া ছিল, নতুন হেড মাষ্টার একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে স্কুলের কাজে যোগ দেবেন। আর নির্দিষ্ট তারিখের সংগে তার মিলও ছিল।

কিন্তু ভাদুড়ী মশাই মনে মনে স্থির করেছেন অন্য রকম। এক দিনও বিলম্ব না করে তিনি আকস্মিক ভাবে স্কুলে উপস্থিত হয়ে দেখতে চান, দেবশালায় সরকার ও জমিদারের সাহায্যপুষ্ট মাইনর ইস্কুলের শিক্ষাদান কোন্ ধারায় চলে।

এ বিষয়ে সুমন্ত তাঁর সহযোগী। ইতিমধ্যেই সুমন্ত তাঁকে জানিয়েছে, তাদের পূর্বপুরুষ জন-শোষণের অর্থে জনকল্যাণের জন্যে যে সব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গেছেন অর্থাভাবে সেগুলোর অবস্থা আজ শোচনীয়।

দেবশালা পল্লী দাতব্য-চিকিৎসালয়ে ঔষধ বলতে আর কিছু নেই, কাজেই ডাক্তার কম্পাউণ্ডারেরও কাজ নেই বললেই চলে। গাঁয়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুই দীঘি—সাগরদীঘি আর নগরদীঘি—এখন শুধু নামেই তাদের পূর্ব-গৌরব বহন করে চলেছে। অথচ গ্রামের সাধারণ মানুষের কতো উপকার হতে পারে এদের সংস্কার করলে।

হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। এই পরামর্শ দিয়েছেন শরৎ হালদার, সুরেন ঘটক, শৈলেন আচার্য প্রভৃতি পারিষদবর্গ এবং তারাচরণও অবস্থা বিপাকে তা-ই একমাত্র করণীয় বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সুমন্ত তার ঘোর বিরোধী।

জমিদার-পুত্র হলেও নতুন ভাবধারার স্পর্শ লেগেছে সুমন্তর মনে। দেশ আজ আর পরাধীন নয়, বিদেশী শোষণের পথ আজ অবরুদ্ধ। জাতির কল্যাণে জাতীয় সরকার যখন জমিদারীর বিলোপ সাধন প্রয়োজন বলে স্থির করেছেন, তখন দেবোত্তরের আবরণে সেই জমিদারীকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাকে দেশবাসীকে প্রতারণার নামান্তর বলেই মনে করে সুমন্ত। এ সে কিছুতেই হতে দেবে না।

অথচ পূর্বপুরুষের আত্মার তৃপ্তির জন্যে তাঁদের স্মৃতিপূত জমিদারী যেমন করেই হোক রক্ষা করতেই হবে, এই হলো তারাচরণের সংস্কারবদ্ধ ধারণা।

এই দুই মতের মধ্যে কোন মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তাই উভয় পক্ষের জেদ একটা চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছিল।

ঠিক এমনি সময়েই রংগমঞ্চে এসে অবতীর্ণ হলেন সপরিবারে নতুন হেড মাষ্টার ভাদুড়ী মশাই।

কর্তাবাবু ও কর্তামাকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে আসার সময় হঠাৎ কর্তার মাথার দিকের দেয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিরাট তৈলচিত্রখানি প্রথমেই চোখে পড়ে অনীতার। সে তার মাকে ডেকে দেখায় সেই ছবিখানি।

মা দেখেছো, কী সুন্দর ছবি? যেন জীবন্ত বসে আছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া?

বাঃ, ভারি চমৎকার তো!—এই বলে মা আর মেয়ে আর সব দেয়ালের বড়ো বড়ো তৈলচিত্রগুলোর দিকে তাকাতে

যেয়ে চোখ নামিয়ে আনতে বাধ্য হন সংগে সংগেই! বিচিত্র বিসদৃশ সব নগ্ন উলংগ নারীমূর্তি দেখে শিউরে ওঠে অনভিজ্ঞ অনীতা এবং তার মা-ও। জমিদারের শিল্পবোধ আঘাত হানে তাদের রুচিবোধের ওপর। কিন্তু এ নিয়ে কোন কিছু তো আর মুখ ফুটে বলার উপায় নেই সেখানে? তাই তাঁরা ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় যাবার সিঁড়ি ধরে নেমে যান নিচের দিকে। নামতে নামতেও সিঁড়ির দুপাশের দেয়ালে তেমনি সব নগ্ন ছবিই চোখে পড়ে তাঁদের। মন তাঁদের বিষিয়ে ওঠে তাতে।

রাধারমণ পণ্ডিতকে বলে দেওয়া ছিল, নতুন হেড মাষ্টার একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে স্কুলের কাজে যোগ দেবেন। আর নির্দিষ্ট তারিখের সংগে তার মিলও ছিল।

কিন্তু ভাদুড়ী মশাই মনে মনে স্থির করেছেন অন্য রকম। এক দিনও বিলম্ব না করে তিনি আকস্মিক ভাবে স্কুলে উপস্থিত হয়ে দেখতে চান, দেবশালায় সরকার ও জমিদারের সাহায্যপুষ্ট মাইনর ইস্কুলের শিক্ষাদান কোন্ ধারায় চলে।

এ বিষয়ে সুমন্ত তাঁর সহযোগী। ইতিমধ্যেই সুমন্ত তাঁকে জানিয়েছে, তাদের পূর্বপুরুষ জন-শোষণের অর্থে জনকল্যাণের জন্যে যে সব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গেছেন অর্থাভাবে সেগুলোর অবস্থা আজ শোচনীয়।

দেবশালা পল্লী দাতব্য-চিকিৎসালয়ে ঔষধ বলতে আর কিছু নেই, কাজেই ডাক্তার কম্পাউণ্ডারেরও কাজ নেই বললেই চলে। গাঁয়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুই দীঘি—সাগরদীঘি আর নগরদীঘি—এখন শুধু নামেই তাদের পূর্ব-গৌরব বহন করে চলেছে। অথচ গ্রামের সাধারণ মানুষের কতো উপকার হতে পারে এদের সংস্কার করলে।

এ সবই সুমন্ত ছু ঘণ্টা ধরে ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে ভাহুড়ীকে।

সহসা স্কুল-বাড়িতে উপস্থিত হয়েই বিস্মিত হয়ে যান হেড মাষ্টার।

আজই আরামের শেষ দিন ধরে নিয়ে রাধারমণ পণ্ডিত এবং আর একজন শিক্ষক এক খেজুরপাতার চাটাইয়ে শুয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিলেন তখন নাক ডাকিয়ে।

তাঁদের পাশেই জন পনেরো নগ্নগাত্র ছেলে-মেয়ে তাল-পাতার চাটাইয়ে বসে গোলমাল করছে! আর একটু দূরে আরো একটু বেশি বয়সের দশ বার জন ছাত্র-ছাত্রী মাটিতে ঘর এঁকে গুটী খেলছে ছুভাগে গোল হয়ে বসে।

আর এক কোণের ঘরে বার-তের বছর বয়সের জন চার ছেলে বেশ গল্প জমিয়েছে বসে বসে। তাদের মাষ্টার মশাই তখনো পর্যন্ত স্কুলেই আসেন নি। আর আজ তো শেষ দিন, একটু জিরিয়েই নেয়া যাক, হয়তো এই ধারণা।

শিক্ষকদের হাজিরা খাতায় ঐ দিনই নতুন প্রধান শিক্ষক মশাই তাঁর নাম সই করলেন—শ্রীনীলকমল ভাহুড়ী। মাষ্টার মশাইরা এই দেখে নিশ্চয়ই সবাই চমকে উঠবেন।

ছেলেমেয়েদের চার ক্লাসের চারখানা হাজিরা খাতায় তো নাম কম নেই, তবে উপস্থিত এতো কম কেন?

হেড মাষ্টারের মনে প্রশ্ন জাগে। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে সারা গ্রামে ঢোল পিটিয়ে আহ্বান জানালেন, আবশ্যিক ভাবে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাতে। ছু দিন অপেক্ষা করেও দেখলেন। কিন্তু তেমন কোন সাড়াই তো পাওয়া গেল না গ্রামবাসীদের কাছ থেকে!

তাই তার কারণ অনুসন্ধানে লেগে গেলেন ভাহুড়ী মশাই। এ অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা নতুন হেড মাষ্টারের জীবনের এক নতুন শিক্ষা।

দেবশালার গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য বর্ণনার ভাষা নেই ভাহুড়ীর। এক ছাত্রীর বিধবা মা তাঁকে জানিয়েছেন—বাবা, লেকাপড়া মেয়েকে শেখাতে আমার অমত নেই। কিন্তু ইস্কুলে আমি মেয়েটাকে পাঠাই কি করে? দশ বছরের মেয়ে—না আছে একটা জামা, না আছে একখানা কাপড়—ছেঁড়া ন্যাতা পরে থাকে। এ ভাবে ঘরে থাকাই দায়। তারপরে খেতেই বা দিব কি? সারা দিন আমি গতর খাটাই—মেয়েটা ঘর আগলায়। হয়তো দু-এক নাদা গোবর কি দু-চারখানা শুকনো ডাল বা দুমুঠো শুকনো পাতা জোগায়। তা না হলে যে যা-ও এক-আধ মুঠো দানা জোগাড় করে আমি আনি তাও সিদ্ধ হবার উপায় থাকে না।

প্রায় সব বাড়িরই এ অবস্থা। পরের জমি চাষ করে যা মেলে তাতে দু-তিন মাস, বড়ো জোর বছরের ছ মাস কোন রকমে চলে। তাও আবার সবার ভাগ্যে জোটে না। তাদের ভরসা দিন-মজুরী। জুটলো তো খেতে পেলো, না জুটলো অনশন। ইচ্ছে থাকলেও এরা লেখা-পড়া শেখাবে কি করে ছেলে-মেয়েদের?

একটি ছেলে রোজই টিফিনের সময় সেই যে চলে যায়, আর সে স্কুলে ফিরে আসে না। ভাহুড়ী মশাই সেই ছেলেটির ওপর লক্ষ্য রাখছিলেন কদিন ধরে। কেন সে এমনি করে রোজ স্কুল পালায়? এক দিন তাকে ডেকে সে কথা জিগ্যেস করলে ভয়ে সে কেঁদে ফেলে হেড মাষ্টারের সামনে। তারপর তাঁর অভয় পেয়ে সে খুলে বলে সব কথা।

যে ছোট গামছাখানা পরে ছেলেটি স্কুলে আসে তা পরেই নাকি স্নান করতে হয় বাড়ির সবাইকে। তাই বেলা দুটোর মধ্যে বাড়ি চলে যেতে হয় তাকে। সে গেলে তবেই নাকি বাড়ির সকলের স্নান খাওয়া।

ভাদুড়ী শিউরে ওঠেন দেবশালার মানুষের এমনি সব দারিদ্র্যের কথা শুনে।

এ অবস্থায়ও সকলকেই জমিদারের খাজনা দিতে হয়। তা না হলে লাঞ্ছনার সীমা থাকে না।

অনীতা তার বাবার কাছ থেকে এ গাঁয়ের মানুষদের দুঃখ-দুর্দশার নানা কাহিনী শোনে। তার মনও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে এ সব কথায়।

এমন কি কেউ নেই, যে এদের হয়ে দুটো কথা জমিদার ও সরকারকে বলতে পারে? সুমন্তকে তো খুবই সহানুভূতিশীল লোক বলেই মনে হয়। আচ্ছা, তাকে একবার বলে দেখলে হয় না?—অনীতার মনে এমনি সব প্রশ্ন জাগে।

আচ্ছা সুমন্তদা, সারা দেশ জুড়েই তো দুঃখ-দারিদ্র্য। কিন্তু তোমাদের গাঁয়ের মানুষদের মতো এতো দুঃখী মানুষ তো কোথাও দেখিনি! এদের পাশে এসে দাঁড়াবার কি কেউ নেই এ গাঁয়ে?

কেন থাকবে না অনীতা? তুমিই তো রয়েছ। তুমি যেমন ভাবছ তেমনি হয়তো আরো কেউ কেউ ভাবছে এই সব লাঞ্ছিত মানুষের কথা। তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে যখন এগিয়ে আসবে, তখন নিশ্চয়ই আর কোন মানুষেরই এমনি অভাব আর লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে না।

সে দিন কথায় কথায় সুমন্তর এ উত্তরে জমিদার-পুত্রের দরদী হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে খুবই খুশি হয় অনীতা। তা ছাড়া এও সে লক্ষ্য করেছে, গরীব হলেও তাদের প্রতি সুমন্তর কোনরূপ উপেক্ষার ভাব কখনো দেখা যায়নি, বরং তাদের সুবিধা-অসুবিধার নিত্য খোঁজ-খবর নেওয়া তার যেন একটা কর্তব্যের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে। ভাদুড়ী মশাই, তাঁর স্ত্রী এবং অনীতা, সবাই কৃতজ্ঞ এজন্যে সুমন্তর কাছে।

নিত্য দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনার ফলে অনীতার সঙ্গে বেশ একটা ঘনিষ্ঠতাও জন্মে যায় সুমন্তর। এদিকে আর কারুর নজর না পড়লেও অনীতার মা সুহাসিনীর লক্ষ্য পড়ে সেদিকে। সুহাসিনী গোপনে এ সম্বন্ধে স্বামীকে একটু ইংগিত দিতে গেলে হেসেই তা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন ভাদুড়ী।

আরে কী পাগল! তোমার মেয়ের সংগে ভাব করতে আসবে ওসব রাজা-মহারাজার ছেলে! তোমার মেয়েকে বিয়ে করে পাটরাণী করে নেবে, কী সখ!

যাও, আমি তাই বলেছি না কি? কোথায় আমি আরো সাবধান হতে বললাম যাতে কোন কেলেংকারি না ঘটে, আর তুমি কি ভেবে নিলে?—সুহাসিনী বেশ চালাকি করে পাশ কাটিয়ে যান এই ভাবে। অথচ আসলে কিন্তু তাঁর মনের ভাব অন্য রকম।

অনীতাকে সত্যিই যদি সুমন্তর ভালো লেগে থাকে এবং সে তাকে বিয়ে করে, মন্দ হয় না কিন্তু! এই হলো সুহাসিনীর মনের কথা।

•

এভাবে আরো কিছু দিন কাটে। তারাচরণের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকেই যায়।

ইদানীং আরো মুস্কিল হয়েছে কর্তামা সৌদামিনীও শয্যা নিয়েছেন। স্বামী ও পুত্রের মধ্যে যে বিরোধ চলেছে তার কোন মীমাংসা করতে না পেরে ভেবে ভেবে মাথাটাও যেন গুলিয়ে গেছে তাঁর। দাউ-দাউ করে যেন আগুন জ্বলে তাঁর মাথায়। সারা রাত জেগে কাটাতে হয় তাঁকে, একটুও ঘুম আসে না। যদিই বা কখনো চোখ বুজে আসে, অমনি 'সুমন্ত, সুমন্ত' চিৎকারে সকলকে ব্যস্ত করে তোলেন তিনি।

সৌদামিনীকে দেখা-শুনো করার ভার নিয়েছেন সুহাসিনী নিজে, আর তারাচরণের শুশ্রূষার ভার পড়েছে অনীতার ওপর।

ঝি-চাকরের সেবায় বিরক্তি বোধ করেন তারাচরণ। সৌদামিনীও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে আরো দ্বিগুণ বেড়ে যায় তাঁর অসুস্থতা।

হঠাৎ একটা সোরগোল পড়ে যায় জমিদার-বাড়িতে। অনীতার চিৎকারে লোকজন সব জড়ো হয়ে যায় কর্তাবাবুর ঘরে। কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্ করছেন তারাচরণ।

মা অনীতা, তুই কি জানিস সুমন্ত কোথায় আছে? আচ্ছা থাক, তোর বাবাকেই একবার ডেকে দে তো মা! তাকেই দুটো কথা বলে যাই।—এই বলতে বলতে হাঁফিয়ে ওঠেন জমিদার।

এই যে আমরা দু জনেই তো এখানে, বলুন।—এই বলে সুমন্তকে হাত ধরে টেনে নিয়ে তারাচরণের সামনে গিয়ে ভাদুড়ী বসে পড়েন মেঝের ওপর।

না, আমার আর কিছু বলার নেই মাষ্টার! অনেক ভেবে দেখলাম, দেবোত্তরের ফাঁকিতে কোনই লাভ নেই আমার, আমাকে সবটাই ফেলে যেতে হবে। কাজেই তোমাদেরই হাতে তুলে দিয়ে গেলাম সব কিছু, যা ভালো মনে হবে তাই করো তোমরা।

তা কেন বাবা! তুমি যে সম্পত্তি দেবোত্তর করার কথা এতো কাল ধরে ভেবে আসছো, সে সম্পত্তি দেবোত্তরই করা হবে, তবে সে দেবোত্তর হবে মানুষ-দেবতার উদ্দেশ্যে—মানুষকে ফাঁকি দেবার জন্যে তথাকথিত পাথরের দেবতার নামে নয়।

ভারি সুন্দর কথা কর্তাবাবু, সুমন্ত ঠিকই বলেছে। এতে

শুধু আপনার নয়, আপনার যে সব পূর্বপুরুষের কথা গভীর ভাবে আপনি ভেবে আসছেন, তাঁদের সকলেরই আত্মা তৃপ্ত হবে গণদেবতার জন্যে আপনার সমগ্র সম্পত্তি উৎসর্গ করা হলে।

বেশ তো, তাই করো তা হলে। তবে যাবার আগে আরো একটা কথা বলে যাই হেড মাষ্টার! আমি জানি, অনীতা মা আমার সুমন্তকে বড্ড ভালবাসে। মানুষ-দেবতার সেবায় ওদের দুজনকে মিলিয়ে দাও তুমি। আমার আর সময় নেই, আমি আর তা দেখে যেতে পারলেম না।

এই বলে তারাচরণ সেই যে ঘুমিয়ে পড়লেন, সে ঘুম আর তাঁর ভাঙলো না।

উত্তর পুরুষ

সাদা মেঘের দল সাদা পারাবতের সংগে যেন সার বেঁধে উড়ে চলেছে।

নন্দিতার মনে যে দুঃখের লেশমাত্র আছে বাইরে থেকে তা টের পাবার কোনো উপায়ই নেই। সবার সংগে হেসে-খেলে কাজ-কর্মে তার দিন কেটে যায়। কখনো তার কালো মুখ চোখে পড়েছে কারুর, এ-কথা কেউ বলতে পারবে না কোনো দিন। অথচ নানা রকমের কথা শুনতে হয় তাকে অহরহ।

সংসারে দশ জন দশ রকমের মানুষ। কিন্তু তা হলে কী হবে, নন্দিতার প্রসংগ কখনো উঠলেই সবাই যেন এক সুরে জটলা সুরু করে। কাছে পড়লে নন্দিতা মুচকি হেসে পাশ কেটে চলে যায়। মনের আগুন দপ করে জ্বলে উঠলেও হাসি চাপা দিয়ে সে ঢেকে দেয় সে আগুনকে। একমাত্র ছোট ননদ সবিতা বাড়ি থাকলে কেউ সাহস পায় না কোন বাজে কথা তুলতে।

এমনি করে প্রায় পাঁচ-পাঁচটি বসন্ত চোখের ওপর দিয়ে চলে গেল। সেদিকে আর কারুর খেয়াল থাক না থাক, মণি ঠাকরুণের তা ভুল হবার উপায় নেই। বছর ঘুরে অনিমেষের বিয়ের তারিখ কাছে আসতেই তাঁর আপশোষের মাত্রাও বাড়তে সুরু করে! যে কোন লোককে সামনে পেলেই হলো, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে সেই একই ধরণের কথা বার বার করে বলে তবে শান্তি!

নাতির মুখ দেখে যাওয়া, সে বহু ভাগ্যের ফল। সে আর আমার অদৃষ্টে নেই। চার কুড়ি বয়েস কাটিয়ে দিয়েও সে সৌভাগ্য যখন আর হলো না, তখন আবার কিসের আশা? ভগবান তো আর চিরকালের জন্যে আমায় এ সংসারে পাঠাননি!—এমনি আরো কতো কি বলেন মণি ঠাকরুণ। বিশেষ করে ছেলের বিয়ের তারিখের আগে-পিছেই যেন তাঁর মনে এ সব কথা বেশি করে ভিড় জমিয়ে থাকে।

সুন্দরগড়ের জমিদার-বংশ অনিমেষ পর্যন্ত এসেই শেষ হয়ে গেল হয় তো! জমিদারীরও শেষ, বংশেরও শেষ!—মণি ঠাকরুণ একা-একা বসে ভাবতে ভাবতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন একটি।

সুন্দরগড় এখন গংগাগর্ভে। অনিমেষের পিতামহ বেঁচে থাকতেই তারা কোলকাতার অধিবাসী। কিন্তু তবুও সুন্দর-গড়ের পরিচয় তারা ছাড়েনি এ অবধি। সেই জমিদারী লাইনে পূর্ণচ্ছেদ পড়তে চলেছে, মণি ঠাকরুণের দুঃখ না হয়ে পারে তাতে?

আত্মীয়-স্বজন, জানাপরিচিত সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার ও প্রীতির পাত্র মণি ঠাকরুণ। কিন্তু ইদানীং অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সবাই যেন তাঁকে এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করে।

একই বিষয় নিয়ে বার বার আলোচনায় কার না অরুচি আসে? মণি ঠাকরুণের কিন্তু এতে একটুও বিরক্তি বোধ নেই।

জয় রাধাগোবিন্দ, ভিক্ষে দেবে মা চারটি!—এই বলে এক ভিখারিণী দোর গোড়ায় এসে উপস্থিত হতেই মণি ঠাকরুণ এসে এক মুষ্টি চা'ল আর একটি পয়সা নিয়ে হাজির সেখানে। তাঁর পরিচিত ভিখারিণীই তো আবার এসেছে!

কি গো, তোমার গোবিন্দের দয়া তো হলো না! একটু ভালো করে প্রার্থনা জানাও তোমার ঠাকুরের কাছে, আমি যেন নাতির মুখ দেখে যেতে পারি।—ভিক্ষা দিতে দিতে মণি ঠাকরুণ আকুল আবেদন জানান ভিখারিণীর কাছে।

গোয়ালা দুধ দিতে আসে, দেখা হয়ে গেলে সে-ও নিস্তার পায় না মণি ঠাকরুণের হাত থেকে। তাঁর দুঃখের দু চারটে কথা শুনে যেতেই হয় তাকে।

অনেকগুলো ছেলে-মেয়ের মা মণি ঠাকরুণ। কিন্তু এক অনিমেষ ছাড়া বড়ো তিন ছেলেই তাঁর বিদায় নিয়েছে স্কুল-কলেজে পড়তে পড়তে। ছোট মেয়ে সবিতা বাদে বাপই বিয়ে দিয়ে গেছেন এক এক করে ছয় মেয়েকে। নন্দিতাকেও বধূরূপে তিনিই এনেছেন। কিন্তু পুত্রবধূর সেবা-ভোগ বেশি দিন তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তিনিও বিদায় নিয়েছেন ছেলেকে বিয়ে দেবার দু বছরেই মধ্যেই।

বিয়ের কথা উঠলে জ্বলে পুরে ওঠে ছোট মেয়ে সবিতা। কলেজী শিক্ষা শেষ করে সমাজসেবার কাজ নিয়ে মেতে আছে সে।

এমনি নানা রকমের দুঃখে অন্তর ভরে আছে মণি ঠাকরুণের। কিন্তু সব দুঃখকে যেন ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর পৌত্রলাভের ব্যর্থতার দুঃখ।

যাই হোক, ঘুরে ফিরে মেয়েরা আসে মায়ের কাছে। তাদের ছেলে-পুলেদের হাসিতে হৈ-হল্লায়ই ভরে থাকে বাড়ি।

এমনি অবস্থায় একদিন অনিমেষ মাকে খুশি করার জন্যে বলে, এতো নাতি-নাতনি থাকতেও তোমার দুঃখ করার কী আছে মা? সমীরকে, অংশুকে বরং রেখে দাও না তোমার কাছে? নীতাও একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। চারটে ছেলে মেয়ের হাংগামা সহ্য করা তো বড়ো কম কথা নয়।

হ্যাঁ, 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে কি- না! মেয়ের ঘরের নাতিকে কাছে এনে রাখলেই যদি সে আনন্দ পাওয়া যেতো, সে পুণ্যি লাভ হতো, তা হলে বামুন বিষ্ণু সাক্ষী রেখে পরের মেয়েকে ঘরে আনার কী দরকার ছিল আমার? নন্দিতাকে এনেছি তোকে সায়েব সাজাবার জন্যে, না?— ছেলের কথায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন মণি ঠাকরুণ।

অনিমেষ আর কথা না বাড়িয়ে সরে পড়ে।

দিল্লী থেকে ছুটিতে বাড়ি এসে মণি ঠাকরুণের নাতি-বাতিকের বাড়াবাড়ি দেখেই অনিমেষ একটু শান্ত করতে চেয়েছিল মাকে, তাঁর সাধ মেটাবার নতুন পথ বাত্‌লে দিয়ে। কিন্তু মায়ের কাছ থেকে কড়া উত্তর পেয়ে আর ভরসা পায় না সে কথা বাড়াতে।

আরে শুনে যা, ও খোকা! কোথায় চলে গেলি আবার হুট করে?—মণি ঠাকরুণ মুহূর্ত না যেতেই আবার ডাকেন ছেলেকে।

কেন ডাকছো মা?—মায়ের ডাক শুনে নন্দিতার ঘর থেকে ছুটে আসে অনিমেষ।

হ্যাঁ রে, তুই তো কোন্ হিল্লী-দিল্লী থাকিস। রামেশ্বর-ধনুষ্কোটি কদ্দূর সেখান থেকে বলতে পারিস?

সে তো অনেক দূর মা!

তা হোক গে। কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে এক বার যেয়ে মাথা কুটে আয়। তার পরে এক বার যদি রামেশ্বর-ধনুষ্কোটি ঘুরে আসতে পারিস বৌমাকে নিয়ে, তা হলে কোটি জন্মের পুণ্যফলে তুই মায়ের মনের সাধ মেটাতে পারবি। সন্তানহীনার সন্তান লাভ ঘটে ধনুষ্কোটির পুণ্য সমুদ্রস্নানে।

এ কি খুব সহজ ব্যাপার মা! কোথায় দিল্লী ভারতবর্ষের

উত্তর প্রান্তে, আর রামেশ্বর দক্ষিণ সীমায়। অনেক টাকা-পয়সারও দরকার। আর এতো উতলাই বা তুমি হয়ে পড়ছো কেন মা? ভাগ্যের ওপর তো তোমার খুব বিশ্বাস। ভাগ্যে থাকলে নাতির মুখ তুমি নিশ্চয়ই দেখে যাবে।

এ কথা তুই ঠিকই বলেছিস খোকা! ভাগ্যে না থাকলে কিছুতেই কিছু হবে না। আর ভাগ্যে থাকলে আশা পূর্ণ হবেই হবে।—ব্যস্, মণি ঠাকরুণ ছেলের যুক্তি মেনে নেন এই বলে।

নীতার সামনেই এ-সব কথাবার্তা হচ্ছিল মা ও ছেলের মধ্যে। একটু দূরেই ছিল শশধর। খুবই আমুদে ও রসিক মানুষ অনিমেষের এই ভগিনীপতি। কখন কাকে কোন্ প্রশ্ন করে বসে, সবাই শংকিত থাকে সেই ভয়ে।

মা ও ছেলের আলাপ-আলোচনা সবই বেশ মন দিয়েই শুনছিল শশধর। হঠাৎ সে উঠে যায় নন্দিতার ঘরে।

আরে কী পাগলামোই না করছো বৌদি, এতে কি আর মায়ের মনের সাধ মেটে কখনো?—পুষিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে দেখে নন্দিতাকে ঘায়েল করে শশধর এই প্রশ্নবাণে।

নন্দিতার হাত থেকে পুষি যেন আপনা থেকেই পড়ে গিয়ে কোথায় দৌড়ে পালিয়ে যায়।

আচ্ছা বৌদি, বলোই না কী তোমাদের রহস্য! এর পরে বাচ্চা হলে তাকে তো ভালো ভাবে মানুষ করে যাবারও অবসর হবে না। এটা কী করছো তোমরা? আর এদিকে মা বেচারা মাথা কুটে মরছেন ছেলের ঘরে ছেলে দেখে যাবার জন্যে।

এ প্রশ্ন আমার কাছে কেন? আপনার দাদাকেই গিয়ে জিগ্যেস করুন না।—ছোট্ট জবাবে নন্দাইকে এড়িয়ে যেতে চায় নন্দিতা।

আরে কী মুস্কিল, দাদাকে এ প্রশ্ন করা চলে না বলেই তো বৌদির শ্রীচরণে এ জিজ্ঞাসা।

আয় বড়ো না হওয়া পর্যন্ত সংসার বড়ো করার দায়িত্ব আপনার দাদা নিতে নারাজ। একগাদা ছেলে-পুলের বাপ-মা হলেই তো হলো না, যদি তাদের ভালো ভাবে মানুষ করে তোলার ব্যবস্থা না করা যায়—আসলে এই হলো আপনার দাদার কথা।—শশধরের পীড়াপীড়িতে রহস্য ফাঁস হয়ে যায় নন্দিতার মুখ থেকে।

ও এই ব্যাপার তা হলে! নীতার কাছ থেকেও অবশ্যি এ রকমেরই আভাস পেয়েছি। তবে একটা কথা বৌদি, আমাদের শোচনীয় অবস্থা দেখেই এরকম সিদ্ধান্ত করেননি তো দাদা?

আরে না না, ছিঃ ছিঃ। এ কি বলছেন আপনি?—নন্দিতার এ উত্তরের পর আর বেশি দূর গড়ায় না এ প্রসংগ।

দেড় মাসের ছুটি অনিমেষের প্রায় ফুরিয়ে এলো।

নন্দিতার ইচ্ছে আর এক বার সে দিল্লীতে যায় অনিমেষের সংগে। অনিমেষেরও কি অনিচ্ছে? তা নয়। তবে মাইনের ভিত্তিতে যেখানে লোকের মেলামেশা, বসবাস সেখানে নিয়ে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে ছোট করতে মন চায় না অনিমেষের।

অনিমেষ নতুন কাজে ঢুকেছে আজ প্রায় তিন বছর। ভালো কাজই বলতে হবে। পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিয়ে যে পদলাভ তা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়! আর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার-দপ্তরের এ্যাসিট্যান্ট ইনফরমেশন অফিসারের চাকরিকে এমন তুচ্ছই বা মনে করার কী কারণ থাকতে পারে?

তবু জানি কেন এ পদলাভে খুব খুশি হতে পারেনি অনিমেষ। এ কাজকে সে তেমন বড়ো কাজ বলে মনেই

করে না। নন্দিতাকে তাই সে মোটেই নিয়ে যেতে চায়নি দিল্লীতে। মায়ের পীড়াপীড়িতে অবশ্য একবার নিয়ে যেতে হয়েছিল তাকে মাস তিনেকের জন্যে। তা ছাড়া নিজের শরীরও তখন তার খারাপই যাচ্ছিল।

কিন্তু নন্দিতা ফিরে আসার মাস ছয় বাদেই মায়ের অসুখের খবর পেয়ে অনিমেষকেও আবার বাড়ি আসতে হয়েছে। নন্দিতাই সে খবর জানিয়েছিল তাকে। হয়তো মায়ের অসুখের খবর ছাড়াও আরো বিশেষ কোন কথা ছিল নন্দিতার সে চিঠিতে। তা না হলে এতো বেশি দিনের ছুটি নিয়ে আসবে কেন অনিমেষ? আর মায়েরই বা এমন কি অসুখ? মা নিজেই জানেন না তাঁর অসুখের কথা।

দুষ্টুমি ধরা পড়ে যায় নন্দিতার। অনিমেষকে দীর্ঘদিন ছেড়ে থাকতে ভালো লাগে না তার।

বদলি নেই তোমাদের কাজে?

আছে বৈ কি! সুযোগ পেলেই অন্য কোথাও যাব। হয় কোলকাতায়, নয় বম্বে, নয়তো বা আর কোথাও।

কোলকাতায় যদি বদলি হতে পারো, তা হলে তো খুবই ভালো হবে।

দেখাই যাক্। আগে থেকে তো কিছু বলা যায় না। নতুন জায়গায় বদলি হলেই তোমায় নিয়ে যাব সেখানে।— নন্দিতাকে এই বলে খুশি করে অনিমেষ।

ছুটি শেষ হবার আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। হঠাৎ সরকারী খামে একটা চিঠি আসে দিল্লী থেকে। অনিমেষের অফিসের চিঠি।

চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে যায় অনিমেষ। খুশিও হয়, বিব্রতও বোধ করে সংগে সংগে। এতো তাড়াহুড়ো করে নতুন জায়গার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে সে জন্যে চিন্তা।

চিন্তার আবার কী আছে এতে? দিল্লীতে যেতে গেলেও যেমনি তৈরি হতে হবে, মাদ্রাজে যেতেও তাই।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, আমার আবার কিসের চিন্তা, সংগে যখন তুমি যাচ্ছ!—নন্দিতার কথার জবাবে অনিমেষ নন্দিতাকে খুশি করে এই বলে।

প্রমোশনের কথা জানিয়ে অনিমেষ মাকে প্রণাম করতেই চমকে ওঠেন মণি ঠাকরুণ।

তুই আজই চললি খোকা?

না মা, আরো কদিন তো আছি তোমার কাছে।

বেশ, এবার তো বড়ো কাজ হলো তোর। এবার তা হলে বৌমাকে নিয়ে যা সংগে করে।

তা তুমি যা বলবে, তাই হবে।

হ্যাঁ, তাই কর বাবা। সংগে নিয়েই যা।

বেশ তো, এ নিয়ে আবার এতো কথার কী আছে?

হবে না কথা? খালি কোলে বৌমা আর কতো কাল পড়ে থাকবে আমার কাছে? আমার আর ভালোও লাগে না এ দৃশ্য দেখতে। আমি কি আমার সেবা করার জন্যেই বৌ এনেছি? নাতি-নাতনীর সাধ নেই বুঝি আমার?—এ প্রসংগ যে নিয়ে আসবেন মণি ঠাকরুণ, অনিমেষের তা জানাই ছিল। কাজেই কেটে পড়ার চেষ্টা করে সে।

এবার সব গোছগাছ করে নিতে হয় ধীরে ধীরে।—এই বলে অনিমেষ চলে যায় নিজের ঘরে।

তিন দিন পর সবিতা নিজে গিয়ে দাদা-বৌদিকে তুলে দিয়ে আসে মাদ্রাজ মেলে। বৌদিকে ছেড়ে দিতে খুবই মন খারাপ লাগে সবিতার। কিন্তু তাকে সুখীও দেখতে চায় সে। নিজে তো সে সমাজসেবার নানা কাজ নিয়ে ডুবে থাকে

সারা দিন। কিন্তু বুড়ী মাকে নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে যাওয়া যে খুব সহজ কথা নয়, তা বেশ বুঝতে পারে সবিতা। তাই কিছুদিনের জন্যে নন্দিতা যে নতুন জায়গায় যাচ্ছে সে জন্যে সবিতা আনন্দিতই হয় মনে মনে।

প্রায় ছদিনের একটানা ট্রেণ-জার্নি। বাঙলার শ্যামল কোমল পরিবেশ পেরিয়ে উড়িষ্যা ও অন্ধ্র রাজ্যের পর মাদ্রাজ।

ছু রাত কাটিয়ে চল্‌তি ট্রেণ থেকে সকাল বেলা সমুদ্রের নীলঘন রূপ দেখে চোখ জুড়োয় খানিকটা। তারপর মাদ্রাজ সেন্‌ট্রাল ষ্টেশনে নেমে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে নন্দিতা।

অনিমেষেরও বেশ ভালো লাগে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিট্‌ফাট্‌ চার দিক।

ট্যাক্সি করে আফিস কোয়ার্টারে যাবার পথে নানা দ্রষ্টব্যই চোখে পড়ে। অনিমেষ জিগ্যেস করে করে সব জেনে নেয় ড্রাইভারের কাছ থেকে।

ড্রাইভার কুলি সবাই প্রায় ইংরেজিতে কথা বলতে অভ্যস্ত মাদ্রাজে। ইংরেজি যেন অনেকটা মাতৃভাষাই ওদের।

চলতে চলতেই ড্রাইভার দূর থেকে দেখিয়ে দেয় বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর কর্পোরেশন বিল্ডিং, মোরে মার্কেট, গীর্জার মতো দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের লাল চূড়ো, ঘোড়দৌড়ের মাঠ এবং আরো কতো কি!

কস্তুরী-বিল্ডিং-এর গা ঘেঁষেই যায় ট্যাক্সি। গুরুগম্ভীর বিরাট এক বাড়ি। এইতো বিখ্যাত 'হিন্দু' পত্রিকার অফিস। এ কাগজের কথা জানাই ছিল অনিমেষের। প্রথমেই যোগাযোগ করতে হবে তাকে এ আফিসের সংগে।

গাছ-পালায় বাগ-বাগিচায় চমৎকার ঘনসবুজ রূপ মাদ্রাজ শহরের। কোলকাতার সঙ্গে মনে মনে তুলনা করে অনিমেষ। নন্দিতাও।

মাউন্ট রোডের ওপর দিয়ে ট্যাক্সি চলেছে।

রাজপথের বুকের ওপর ট্রাম লাইন চিরনিদ্রায় অভিভূত। ট্রাম চলা চিরকালের মতো বন্ধ হয়েছে মাদ্রাজ শহরে।

মাউন্ট রোডের ওপরেই অনিমেষের অফিস। অফিস আর কোয়ার্টার একই বাড়িতে। ছায়াঘন বিরাট এক বাগানবাড়ি জুড়ে তার এলাকা।

কোয়ার্টারে ঢুকেই নন্দিতা যেন সারা বাগানবাড়ির ওপর তার মনের পাখা মেলে ধরে। কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সে। যখন যেমন মন চাইবে তেমনি ভাবেই ঘুরে বেড়াতে কোন অসুবিধেই হবে না এখানে।

মুক্ত পরিবেশ পেয়ে সতেজ সবল হয়ে ওঠে নন্দিতার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা।

দক্ষিণ ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক প্রচার বিভাগীয় অফিসের ভার বুঝে নেয় অনিমেষ। তার পূর্ববর্তী অফিসার ইয়োরোপ গিয়েছেন বৈদেশিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে। সরকারই পাঠিয়েছেন তাঁকে। ছ মাস থাকতে হবে তাঁকে বিদেশে। তাঁরই বদলে এ কয়মাস অনিমেষের পরিচালনায় চলবে মাদ্রাজ অফিস।

মাত্র তিন বছর এ্যাসিষ্টান্ট ইনফরমেশন অফিসারের কাজ করে এ্যাক্টিং ডেপুটি হয়ে একটা জোনের চার্জ পাওয়া বড়ো কম কথা নয়। এও একটা বিশেষ রকমের স্বীকৃতি বৈকি! অনিমেষের জীবনে উন্নতির সোপান খুলে গেল বুঝি! নন্দিতাও তাই আনন্দে ফেটে পড়ে যেন।

মঠ-মন্দিরের দেশ দক্ষিণ-ভারত। প্রাচীন শিল্পকলার অজস্রতা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। রামায়ণের এক বিরাট অংশ রচিত হয়েছে দাক্ষিণাত্যের নানা রাজ্যের নানা কাহিনী নিয়ে। মহাভারতেরও বহু প্রসংগের নিদর্শন আজও বর্তমান রয়েছে এ প্রান্তে।

এক এক করে দর্শনীয় স্থানগুলো এক বার অন্তত ঘুরে আসা উচিত—কিছু দিন যেতেই মনে মনে চিন্তা করে অনিমেষ। স্থিরও করে ফেলে।

রোববার রোববার এক এক দিকে বেরিয়ে পড়ে তারা স্বামী-স্ত্রী। অনিমেষের সহকারী স্বামীনাথনও সংগে যায় তাদের গাইড হিসেবে। মহাবলীপুরম্, পক্ষীতীর্থ, কাঞ্জিভেরম্ প্রভৃতি অনেকগুলো প্রসিদ্ধ স্থানই তাদের দেখা হয়ে যায় এই ভাবে। অপূর্ব শিল্পচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে ফেরে তারা এ সব স্থান থেকে। নানা অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনে আবার বিস্মিতও হতে হয় তাদের সময় সময়।

রামেশ্বর-ধনুষ্কোটি যাওয়া ঠিক হয়েছে এবার।

মায়ের কথা মনে পড়ে যায় অনিমেষের। প্রথমে কাশী-বিশ্বনাথ দর্শন করে তার পরে নাকি রামেশ্বর-শিব দর্শনের রীতি। কিন্তু পুণ্য লাভ তো আর উদ্দেশ্য নয় তার, দক্ষিণ-ভারতের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভই তার লক্ষ্য। নন্দিতাকে নিয়ে এক এক করে সবই সে দেখবে। চিদাম্বরমে নটরাজ মন্দির, শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথ বিষ্ণুমন্দির, তাঞ্জোরের চোলরাজদের প্রতিষ্ঠিত বৃহদেশ্বর মন্দির ও মারাঠারাজদের সরস্বতী মহাল লাইব্রেরী এবং ভারত-ভূমির শেষ প্রান্ত কন্যাকুমারী ইত্যাদি সবই এ কয় মাসের মধ্যে দেখে যেতে হবে, অনিমেষের তাই ইচ্ছে।

মাদ্রাজের দু নম্বর ষ্টেশন এগমোর। দক্ষিণ ভারতের তীর্থগামীরা তাদের তীর্থপরিক্রমা সুরু করে সাধারণত এই রেল-ষ্টেশন থেকেই।

সন্ধ্যায় রওনা হয়ে গল্পে গল্পে অনেক রাত হয়ে যায়। ট্রেণে ভালো ঘুম হয় না অনিমেষের। নন্দিতাকেও সে ঘুমুতে দিতে চায় না।

আর একজনমাত্র বয়স্ক তামিলী ভদ্রলোক তাদের কামরায়। তিনি অনেকক্ষণ আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আর না ঘুমুলেই বা কি! অনিমেষ-নন্দিতার কথাবার্তার বিন্দু-বিসর্গও তামিলী ভদ্রলোকের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। তার ওপর ভদ্রলোকের যখন নাসিকাগর্জন সুরু হয়ে গেছে, তখন নানা রকমের হাসি-ঠাট্টায় নন্দিতাকে অস্থির করে তুলতে আর আটকায় না অনিমেষের।

হ্যাঁ ভালো কথা, স্বামীনাথন্ বলছিলো একেবারে সোজা রামেশ্বরমে চলে যাবার কথা। সন্ধ্যার আগেই মন্দির দেখা শেষ করে আরতি ও দেবদর্শন করা যাবে। তারপর ভোর রাত্রির ট্রেণে ফেরার পথে ধনুষ্কোটিতে যাওয়া হবে। তোমার কী মত, বলো।

এতে আবার আমার মতামতের কী দরকার পড়লো? যা ভালো মনে করো তাই করবে।—নন্দিতা উত্তর দেয়।

তা তো নিশ্চয়ই। তবে মা যে বলে দিয়েছেন, তাঁর কী হবে?

কী আবার বলে দিয়েছেন মা?

সেই যে, ধনুষ্কোটিতে জোড়ে সমুদ্রস্নান করে রামেশ্বরে শিবদর্শন করলে সন্তানহীনার সন্তান লাভ ঘটে! এই সহজ নিয়মটুকু পালন করে যদি মায়ের ইচ্ছা পূরণ করা যায়, মন্দ কি? দেখাই যাক না চেষ্টা করে।

ও, খুব যে মাতৃভক্ত একেবারে। মাতৃ-আজ্ঞা পালনের অপেক্ষায় থাকবার ছেলেই তুমি!—এই বলতে গিয়ে একগাল হেসে ফেলে মুখ ঘুরিয়ে নেয় নন্দিতা।

কী বললে?—ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠে অনিমেষের চোখ

ছুটো। নন্দিতার কথায় কেমন একটা অভিনব আনন্দের আকস্মিক উত্তাপ যেন অনুভব করে সে। আর একটু পরিষ্কার করে শুনতে ইচ্ছে হয় তার সে কথা।

কী আবার বলবো, তোমার মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করার সমস্ত ব্যবস্থাই তো তুমি করে রেখেছ। কাজেই ধনুষ্কোটিতে আগে সমুদ্রস্নান করে রামেশ্বর মন্দিরে যাবে, না রামেশ্বরে শিবদর্শন সেরে এসে সমুদ্রস্নান করবে, তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই, এ কথাটাই আমি বলছিলাম।

নন্দিতার উত্তর শুনে সমস্ত দেহ জুড়ে যেন কেমন একটা বিদ্যুৎ খেলে যায় অনিমেষের। নন্দিতাকে জড়িয়ে ধরতে আকুল হয়ে ওঠে তার মন। কিন্তু সংকোচবোধ বাধা দেয়। অপর এক জন যাত্রী রয়েছে যে কামরায়!

আচ্ছা লোক তো তুমি! কিছু জানতে না দিয়ে বেমালুম গোপন করে রেখেছ ব্যাপারটা?

বারে, জানাবার আর তুমি ফুরসুৎ দিচ্ছ কোথায়? আর না জেনেই আনন্দে অধীর হয়ে যে রকম ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছ, আগে জেনে ফেললে তোমায় হয়তো ধরে-বেঁধে রাখাও দায় হতো।—নন্দিতার এ কথায় আর হাসি চেপে রাখতে পারে না অনিমেষ।

কিন্তু ঐ হাসি পর্যন্তই। তার পর আর একটি কথাও মুখ ফুটে বেরোয় না অনিমেষের। অথচ কেমন একটা অনুভূতি তার সমস্ত স্নায়ুগুলিকে যেন সারা রাত্রির মতো অধিকার করে বসে।

নন্দিতা কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে শেষ প্রশ্নোত্তরের কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

ভোর হবার সংগে সংগেই ষ্টেশনে এসে গাড়ি থামে। অনেকক্ষণের ষ্টপেজ। পাশের কামরা থেকে স্বামীনাথন্ খোঁজ-

খবর নিতে আসে অনিমেষদের। অনিমেষ ডেকে নেয় তাকে নিজেদের কামরায়। তার পর ভেণ্ডারের কাছ থেকে এক পট চা আর কেক নিয়ে গল্প করতে করতে খায় তিন জনে। প্রোগ্রাম নিয়েও আলোচনা চলে। তবে আলোচনা আর কী, স্বামীনাথনের ব্যবস্থাই পুরোপুরি মেনে নেওয়া। ধনু-ষ্কোটিতে সকাল-সন্ধ্যা ছুটো সময়ের সমুদ্র-দৃশ্যই নাকি দেখার মতো। তবে সময় যখন ততো হাতে নেই, তখন রামেশ্বর-মন্দির দর্শনের পরেই ধনুষ্কোটি যাওয়া ভালো, একথা মেনে নিতে হয় অনিমেষকে।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পেরিয়ে ট্রেণ এগিয়ে চলে। সকাল আর মধ্যাহ্ন পেরিয়ে অপরাহ্নে এসে দাঁড়ায় সূর্যরথ।

মণ্ডপম্ ষ্টেশনে এসে ট্রেণ থেমে যায়। মনে হয় আর এগুবে না। কোথায় এগুবে? মূল ভূখণ্ডের শেষ এখানে। সামনে সমুদ্র। তবে অদূরেই সমুদ্রবেষ্টিত রামেশ্বর দ্বীপ। উত্তর-ভারতে পরিচিত নাম রামেশ্বর, দক্ষিণ-ভারতের লোকেরা বলে রামেশ্বরম্।

সেতুর সাহায্যে যাতায়াত করতে হয় মূল ভূখণ্ড থেকে রামেশ্বরমে। সেতুর নাম পাম্বান ব্রিজ। ব্রিজ পার হয়েই পাম্বান ষ্টেশন। খুবই ধীরে ধীরে ট্রেণ চলে এই সেতুর ওপর। ট্রেণ পার হয়ে গেলেই লোহার রেল-লাইন ভাঁজ করে সরিয়ে রাখতে হয়, সমুদ্রের লোণা জলে মরচে যাতে না ধরতে পারে সেজন্যে। পুরোনো হাওড়া পুলের মতো পুল অনেকটা।

পাম্বান ব্রিজ পার হবার সময় ট্রেণ থেকে সমুদ্রের দৃশ্য দেখতে দেখতে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ে অনিমেষ। মুগ্ধ-বিস্ময়ে নন্দিতাও চেয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে। বিরাট বিরাট পাথরের খণ্ড ফেলে সমুদ্রের তরঙ্গকে ব্যাহত করা হয়েছে সেতুটিকে রক্ষা করার জন্যে।

মণ্ডপম্ থেকে পাম্বান। এই সামান্য সমুদ্রপথ পারাপারের জন্যে একালের মানুষকে তার বিপুল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও উপাদান সত্ত্বেও কম হয়রান হতে হয়নি! সেই রামায়ণের যুগে শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্যে কী করে যে তাঁর লংকা অভিযানে দীর্ঘ সমুদ্রপথ পারাপারের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই অসম্ভব কল্পনাকে মনে করতেই যেন শিউরে ওঠে নন্দিতা। কী সুগভীর পত্নী-প্রেমই না ছিল রামচন্দ্রের!

পরক্ষণেই আবার নন্দিতা ভাবে, তার স্বামীরই বা পত্নী-প্রেম কম কিসে! পাছে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, উপেক্ষা করে বসে কেউ ছোট চাকুরের স্ত্রী বলে, সেজন্যে অনিমেষ বঞ্চিত রেখেছে নিজেকে তার সান্নিধ্য থেকে বছরের পর বছর ধরে। প্রথম সুযোগেই সে নিয়ে এসেছে তাকে এই সুদূর সমুদ্র-দ্বীপে, হয়তো পুরুষের পত্নীপ্রেমের গভীরতা কতো দূর হতে পারে অতীতের নিদর্শন থেকে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাবার জন্যেই। আপন চিন্তার যুক্তিজালে এমনি করে নিজের মনকেই আটকে দেয় নন্দিতা।

পাম্বান এসেও ট্রেণ অনেকক্ষণ থামে। ঘন নারিকেল-কুঞ্জ চতুর্দিকে। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত অতি সরল শান্ত মানুষ এই দ্বীপবাসীরা। সমুদ্রের কড়ি আর নানা রকমের শংখ বিক্রির ধূম পড়ে যায় ট্রেণের কামরায় কামরায়। গোছা গোছা ছবিরও বেচা-কেনা চলে। দক্ষিণ-ভারতের নানা মন্দিরের ছবি, দেবদেবীর ছবি। নন্দিতাও কিনে নেয় কিছু কিছু। স্বামীনাথনের নিষেধ উপেক্ষা করেই কিনে ফেলে।

রামেশ্বর ডাক বাংলোতে এসে উঠতে উঠতে বেলা প্রায় পাঁচটা বেজে যায়। সংগের সামান্য মালপত্র বাংলোতে নামিয়ে রেখে ফিরতি ঘোড়ার গাড়ি করেই অনিমেষ সদলবলে যাত্রা করে মন্দিরপথে।

স্বামীনাথন্ পথে বলতে বলতে আসে রামেশ্বর তীর্থের পৌরাণিক কাহিনী।

সীতা উদ্ধারে রাবণের আরাধ্য দেবতা মহাদেবের তুষ্টি বিধানের প্রয়োজন অনুভব করেন রামচন্দ্র। হিমালয় পর্বতে পাঠান তিনি মহাবীরকে কষ্টি-পাথরের শিব আনতে। বিলম্ব দেখে নিজেই বালুকা-স্তূপের এক শিব-মূর্তি গড়ে নিয়ে পূজো আরম্ভ করে দিতেই মহাবীর এসে উপস্থিত। অন্তর্যামী শ্রীরামচন্দ্র ভক্তের মনক্ষোভ বুঝতে পেরে নির্দেশ দিলেন, মহাবীর-আনীত বাণেশ্বর শিবের পূজো না হয়ে ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁর স্বহস্তনির্মিত রামেশ্বর শিবের পূজো হবে না।

এখনো পর্যন্ত সে নির্দেশ যথাযথই নাকি পালিত হয়ে আসছে।

ঘোড়ার গাড়ি থেকেই অদূরে মন্দির দেখতে পায় অনিমেষ। মন্দিরের সম্মুখবর্তী গোপুরম্ দেখে তাকেই মন্দির বলে ভুল করে সে। স্বামীনাথন্ বুঝিয়ে দেয় তাকে, ওটা মন্দির নয়, মন্দিরের গেট—তাকেই গোপুরম্ বলা হয় দক্ষিণ দেশে। প্রায় সব বড়ো বড়ো মন্দিরের চার দিকেই এমনি একটি করে গোপুরম্ মন্দির ভাস্কর্যে দ্রাবিড়ী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে আসছে। রামেশ্বর-মন্দিরের চতুর্থ গোপুরমটি আর সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি হয়তো কোন বিশেষ কারণে। তবু প্রায় চারশ বছর আগে তৈরি এ বিরাট মন্দিরের স্রষ্টাদের উদ্দেশ্যে অনিমেষ মাথা নোয়ায় তাদের শিল্পবোধের কথা স্মরণ করে। যে মন্দির প্রদক্ষিণ করে আসতে সোয়া ঘণ্টারও বেশি সময় প্রয়োজন, সে মন্দিরের কল্পনা যিনি করেছিলেন সেই রামনাদরাজ থিরুমল সেতুপতির উদ্দেশ্যেও অনিমেষের মাথা আপনা থেকেই নুয়ে আসে।

মন্দিরের অভ্যন্তরে ঢুকতেই এক বিরাট মেলা। মেলায়

মন বসে যায় নন্দিতার। তালপাতার ব্যাগ একটা কিনে ফেলে সে সংগে সংগে। ভারি সুন্দর দেখতে ব্যাগটা। বড়ো বড়ো কড়ি, শংখ, ঝিনুক, মালা আরো কতো সব আজেবাজে জিনিষ কিনে দেখতে দেখতেই ব্যাগটাকে সে ভরে ফেলে। স্বামীনাথন্ এমন কি অনিমেষের তাগিদেও যেন ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

শুধুমাত্র পুণ্যার্থীদেরই যে ভিড় মন্দিরে ও তার চার পাশে তা নয়, অল্প হলেও বেশ কয়েক জন বিদেশীকেও মন্দির-চত্বরে চোখে পড়েছে অনিমেষের। তাদের মধ্যে দু জনকে সে দেখেছে ফটো তুলতে। কী গভীর তাদের আগ্রহ ফটো তোলার!

বিদেশীদের ছোট্ট আর একটি দল কী যেন টুকে টুকে নিচ্ছে ঘুরে ঘুরে। সমুদ্রতীরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে একজন মাদ্রাজী শিল্পীকে একান্তে একটি স্কেচ আঁকতে দেখে থমকে দাঁড়ায় অনিমেষ আর নন্দিতা।

শিল্প ও সাহিত্যের বহু উপাদান সংগৃহীত হয়ে থাকে এ-সব দেবস্থান থেকে।—স্বামীনাথন্ বলে ইংরেজিতে।

এ সবই যে আমাদের দেশের ঐতিহ্য, আমাদের মূল পরিচয়। জাতীয় শিল্প ও সাহিত্য এ-সবকে বর্জন করে নয়, ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে, তাইতো স্বাভাবিক।—অনিমেষ উত্তর দেয়।

শুধু এই নয় স্যর, বহু ভূতাত্ত্বিক,নৃতাত্ত্বিক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকও প্রায়ই আসেন এখানে।

তা তো আসবেনই। আমাদের দেশের ধর্মস্থানগুলোকে কেবলমাত্র কুসংস্কার ও গোঁড়ামির কেন্দ্র বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা ভুল করেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ-ক্ষেত্রগুলো সম্বন্ধে একটু চিন্তা করলেই জানা যাবে যে, এ সমস্ত তীর্থের মাহাত্ম্য শুধু ধর্মীয় নয়, তার পিছনে রয়েছে আরো অনেক কারণ।

সব কিছু দেখাশুনো শেষ করে তারা যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে রাত তখন অনেকখানি।

মাদ্রাজী খানায় অসুবিধে হবে অনিমেষদের, এ আশংকা জানায় স্বামীনাথন্।

না কোন অসুবিধেই হবে না। সামান্য কিছু ইড্‌লি, দোসা আর রসম্ হলেই তাদের চলে যাবে। মাদ্রাজী খানা ভালোই লাগে তার কাছে, অনিমেষ বলে স্বামীনাথন্‌কে। হয়তো সহকারীকে খুশি করার জন্যেই বলে। চালের পিঠে বা ডালের বড়া জাতীয় খাদ্য যে নন্দিতার পছন্দ নয়, সেকথা বেশ ভালো করেই জানে অনিমেষ। কিন্তু কারু সামনে তাদের খাদ্যের প্রতি কোন রকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা উচিত নয়, এ কথা সে বুঝিয়ে দিয়েছে নন্দিতাকে।

হোটেল থেকে ডাকবাংলোতে খানা আসে। খাওয়া তারা সেরে নেয় সেখানে বসেই।

ভোর রাত্রির ট্রেণে পাম্বানে এসে আবার নতুন ট্রেণে উঠে ধনুষ্কোটিতে আসে তারা। পাম্বান থেকে মাত্র মাইল ষোল পথ। লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই ধনুষ্কোটিতে। ভারত মহাসাগর আর বংগোপসাগরের সংগমস্থলে অসীম সমুদ্রলোক সম্মুখে আর স্থলভাগ সমস্তটাই যেন শুধু বালুচর।

ধনুষ্কোটির মাটিতে পা পড়তেই জন্মদুঃখিনী সীতার কথা মনে পড়ে যায় নন্দিতার।

স্বামীনাথন্ বলেছে, এখান থেকে সমুদ্রপথে মাত্র বাইশ-তেইশ মাইল দূরে সিংহল, রাবণ রাজার স্বর্ণলংকা। রামায়ণের যুগে এ দূরত্ব ছিল নাকি অনেক বেশি! কিন্তু একালের এই সামান্য দূরত্ব ভেদ করে দৃষ্টি পৌঁছুবে কি সিংহল দ্বীপে?

ট্রেণ থেকে নেমেই নন্দিতা তার দৃষ্টি প্রসারিত করে বন্দর বরাবর।

না, কিছুই দেখা যায় না। শুধু জল আর জল! বন্দরে একখানা জাহাজ দাঁড়িয়ে। প্রতিদিনই একখানা করে জাহাজ সিংহল-ভারত যাতায়াত করে এখান থেকে।

সেই অশোক-কানন কি এখনো আছে, যেখানে সীতাকে নানা রকমের লাঞ্ছনা সহ্য করতে হতো রাক্ষসরাজের চেড়ীদের হাতে?

কোন্ সুদূর অতীতের এক কাহিনীর নায়িকার ব্যথায় অন্তর কেঁদে ওঠে নন্দিতার। ভারতীয় নারীত্বের অবমাননার যে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, আজকের ভারত-সন্তান পারবে কি তেমনি নারী-লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে?

এ কঠোর জিজ্ঞাসা মনে জাগতেই নন্দিতা চমকে ওঠে। সেও তো সন্তানবতী! তেমনি বীর সন্তানই কামনা করে নন্দিতা!

মা তো ঠিকই বলেছিলেন! জোড় বেঁধে সমুদ্রে অর্ঘ্য দানের আর সমুদ্রস্নানের কী ধূম লক্ষ্য করছো?—নন্দিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনিমেষ।

সন্তান লাভের আশায় রোজ এতো লোক আসে এখানে স্নান করতে?

সবাই যে সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে আসে ধনুষ্কোটিতে তা নয়। তা ছাড়া যারা জোড় বেঁধে স্নান করছে তারাও সবাই স্বামী-স্ত্রী নয়।—স্বামীনাথন্ উত্তর দেয় নন্দিতার প্রশ্নের।

তা হলে? স্বামী-স্ত্রী না হলে কাপড়ের আঁচলে আঁচলে বেঁধে এক সংগে ডুব দিচ্ছে সব জোড় হয়ে, তা কী করে হতে পারে?

তা হয় স্যর, বহুকাল থেকেই এ রীতি চলতি রয়েছে এখানে। ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে লোক আসে। অনেকের পক্ষে সস্ত্রীক আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে পুরোহিতের মাধ্যমে কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যে সাময়িক ভাবে

প্রতীক-স্ত্রী লাভের ব্যবস্থা থাকায় কাউকেই সস্ত্রীক ধর্মার্জন বা সন্তান প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত হতে হয় না!

স্বামীনাথনের কাছ থেকে এই অভিনব ব্যবস্থার কথা শুনে হো হো করে হেসে ফেলে অনিমেষ। লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেয় নন্দিতা। ছিঃ ছিঃ, এ মেয়েগুলোর একটুও সংকোচ নেই পরপুরুষের সংগে গাঁটছড়া বেঁধে একত্রে এই তরংগব্যাকুল সমুদ্রে নামতে?

নন্দিতা ধিক্কার দেয় মনে মনে। সমুদ্রস্নানে আনন্দ আছে, সেও স্নান করবে। কিন্তু নিজের স্বামীর সংগে হলেও এ ভাবে জোড় বেঁধে স্নান করতে তার শালীনতায় বাধে।

কী গো, আর দেরি কেন? এসো কাপড়ে কাপড়ে গিঁট দিয়ে নেমে পড়া যাক্।

কেন, কোন্ দুঃখে গিঁট দিতে যাবো? যমজ ছেলের ইচ্ছে বুঝি তোমার?

সর্বনাশ! রক্ষা করো।—নন্দিতার সংগে ইয়ার্কি করতে গিয়ে আচ্ছা জব্দ হয়ে যায় অনিমেষ।

উন্মুক্ত আনন্দময় পরিবেশে সমুদ্রস্নান সেরে ফিরে যাবার পথে অনিমেষের কেবলই মনে হয়, সব সংস্কারই যে সম্পূর্ণ অর্থহীন, সব সময় তা না-ও হতে পারে। কুসংস্কার বর্জনীয়। কিন্তু মানুষকে কোন কামনাসিদ্ধ হতে হলে আনন্দের যে আবেগ প্রয়োজন তা লাভ করার পক্ষে এমন স্থান তো সত্যি দুর্লভ!

মাদ্রাজে ফিরে এসেই অনিমেষ চিঠি পায় দিল্লী থেকে। তার হেড অফিসের চিঠি। মাদ্রাজে তাকে আরো কিছুকাল চার্জ নিয়ে থাকতে হবে। এ আদেশ পেয়ে খুশিই হয় সে।

নন্দিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে কোলকাতার বাড়িতে নানা রকম গুঞ্জন ওঠে।

ধনুষ্কোটিতে জোড়া স্নানে ফল না হয়ে পারে? রামেশ্বর শিব মনস্কামনা পূর্ণ করুন আমার।—উঠতে বসতে মণি ঠাকরুণের মুখে সেই একই কথা।

আরো কিছুকাল কেটে যায়। মাদ্রাজ থেকে হঠাৎ তার আসে। বাড়িতে হট্টগোল পড়ে যায় নন্দিতার ছেলে হবার খবর পেয়ে।

দেখলে তো, বুড়ো মানুষের কথাকে তোমরা আমোলই দিতে চাও না, মণি ঠাকরুণকে পাগল বলে উড়িয়ে দিতে চাও? এখন সেই পাগলের কথাই তো ঠিক হলো!—পাশের বাড়ির চপলা মাসি তারের খবর পেয়েই ছুটতে ছুটতে এসে সবিতার সামনে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে থাকেন।

মণি ঠাকরুণ তখন খুবই অসুস্থ। নাতির খবর পেয়ে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। ভুলে যান তিনি তাঁর অসুখের কথা।

পাল্টা তারে সবিতা তাড়াতাড়ি এক বার আসতে লেখে দাদাকে মায়ের অসুখের খবর জানিয়ে।

অনিমেষ যখন সস্ত্রীক ও সপুত্রক বাড়ি আসে, মণি ঠাকরুণের তখন শেষ দশা। কিন্তু তাদের আসার সংবাদ পেয়েই তিনি যেন হঠাৎ তাজা হয়ে ওঠেন ক্ষণকালের জন্যে।

ওরে, নিয়ে আয় আমার রামেশ্বরকে!

রামেশ্বর ডাকের সংগে সংগে এক ঝলক হাসির ঔজ্জ্বল্য এসে যেন ঢেকে দিয়ে যায় মণি ঠাকরুণের মৃত্যু-যন্ত্রণার কালিমাকে। তিনি অপলক চোখে চেয়ে থাকেন নন্দিতার কোলের খোকার দিকে।